কবিতা পাঠ

1. কবিতা পাঠ
2. রাধার কী হৈল অন্তরে ব্যথা
3. পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল
4. কাশীরাম দাস
5. প্রশ্ন

শব্দার্থ ও টীকা

1

কবিতাপাঠ

1.1 প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথের মতে কবি নিজের অন্তর থেকে 'বচন' কথা বা শব্দসম্ভার সংগ্রহ করে আনন্দলোক সৃষ্টি করেন। শব্দে, সংগীতে, উপমায়, চিত্রকল্পে ও অনুভূতিকে প্রকাশই হচ্ছে কবিতা।

আনন্দলোক = আনন্দের জগৎ।

কবিতার দুটি দিক : (১) ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক (২) রূপগত দিক। প্রথমে কবিতায় কী ভাব বা বিষয় প্রকাশ পেয়েছে তা খুঁজে বার করে সেই ভাব বা বিষয়ের মধ্যে মানবজীবনের কোন্ সত্য প্রকাশ পেয়েছে তা আলোচনা করতে হবে। তারপর কবিতার ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কবিতার শব্দ, ছন্দ, অলংকার, চিত্রকল্প কীভাবে সাহায্য করেছে তার বিচার করতে হবে।

অলংকার = কবিতায় অলংকার বলতে বোঝায় অনুপ্রাস, উপমা, রূপক ইত্যাদি।

পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় প্রায় সব দেশের সাহিত্যের সূচনা হয়েছে কবিতা দিয়ে। তার কারণ সুদূর অতীতে যখন লেখার চল ছিল না তখন মানুষ সেসব ঘটনা, অনুভূতি বা আবেগকে স্মরণীয় করে রাখতে চাইত। সেই সব ঘটনা অনুভূতি বা আবেগকে ছন্দের বাঁধনে বেঁধে মনে রাখার চেষ্টা করত। তারপর লেখার চল হলে সেই ছন্দে বাঁধা রচনাগুলো লিখে রাখতে লাগল। এই ভাবে কবিতা লেখার সূত্রপাত হল। লেখার ক্ষেত্রে গদ্যের চল হয়েছে অনেক পরে। অন্য ভাষার সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেরও সূচনা হয়েছে কবিতা দিয়ে। দশম, দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে বৌদ্ধ সাধকেরা যেসব চর্যাপদ লিখেছিলেন সেগুলিই বাংলা কবিতা বা কাব্যসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। চর্যাপদগুলি ধর্মীয় অনুভূতিনির্ভর ছোটো কবিতা। এর পর নানা ঘটনা ও কাহিনি নিয়েও বড়ো আকারের কবিতা লেখা হল। শুরু হল আখ্যানকাব্য লেখা। এইভাবে বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়ে দেখা গেল দু ধরণের কবিতা (১) ছোটো আকারের খণ্ড কবিতা; (২) বড়ো আকারের আখ্যান কাব্য।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি :

- কবিতা কী সে সম্পর্কে সাধারণ ধারণা করতে পারবেন;
- কবির হৃদয়াবেগ ফুটিয়ে তুলতে কবিতার ভাষা ও ছন্দ কীভাবে সাহায্য করে জানতে পারবেন;
- কবিতায় অলংকার ও চিত্রকল্প কী কাজ করে জানতে পারবেন;

শব্দার্থ ও টীকা

- প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের ধারা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- কবিতাতে চিত্রকল্পের স্থান কোথায় জানতে পারবেন;
- প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যের ধারা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবেন;
- ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা কাব্যের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- মহাকাব্য ও গীতিকবিতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

1.3 বিষয়ের রূপরেখা

ক) ছন্দ

কবিতার বাণীরূপের একটি প্রধান উপকরণ হল ছন্দ। কবিতায় মনের ভাবকে স্মরণীয় করে রাখা হয় বলে কবিতায় বাক্যগুলিকে বিশেষভাবে সাজাতে হয়। কবিতায় বাক্যগুলিকে নির্দিষ্ট মাপের ধ্বনি অনুযায়ী সাজানো হয়। কবিতার বাক্যে এই নির্দিষ্ট মাপের ধ্বনি তরঙ্গের বিন্যাসই হচ্ছে কবিতার ছন্দ। আর এই ধ্বনি তরঙ্গের ক্ষুদ্রতম মাপটি হচ্ছে তার মাত্রা।

বাংলা কবিতায় ছন্দের মাত্রাবিন্যাস নানাভাবে হয়। কারণ এই মাত্রাবিন্যাস বা মাত্রার পরিমাণ বা সংখ্যা নির্ভর করে শব্দের মধ্যে কয়টি দল আছে তার উপর। দল হচ্ছে কথা বলার সময় শব্দের যে অংশটি এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়। যেমন : 'জলধর'— এই শব্দটি আমরা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে পারি না, প্রথমে 'জ' উচ্চারণ করে তারপর একটু দম নিয়ে 'ল' উচ্চারণ করি, তারপর একটু দম নিয়ে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করি 'ধর'। এই জ^{১} ল^{১} ধর^{১} — জলধর শব্দের তিনটি দল। দল আবার দুই ভাগে বিভক্ত : মুক্ত দল ও রুদ্ধ দল। যে দলের শেষে স্বরধ্বনি আছে তাকে বলে মুক্ত দল, আর যে দলের শেষে ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে তাকে বলে রুদ্ধ দল। এ দিক থেকে জলধর শব্দের প্রথম দুটি 'জ' ও 'ল' হচ্ছে মুক্তদল। কারণ এদের উচ্চারণ শেষ হচ্ছে স্বরধ্বনি 'অ' দিয়ে, কিন্তু 'ধর' হচ্ছে রুদ্ধ দল, কারণ এর উচ্চারণ শেষ হচ্ছে ব্যঞ্জনধ্বনি 'ধর' দিয়ে। সাধারণ ভাবে সব ছন্দেই মুক্ত দলের মাপ হচ্ছে এক মাত্রা। কিন্তু রুদ্ধ দলের ক্ষেত্রে এক এক ছন্দে এক এক মাপ বা মাত্রা দেখা যায়। এ দিক থেকে ছন্দের মধ্যে তিনটি ধরন বা রীতি লক্ষ্য করা যায়।

এক ধরনের ছন্দে মুক্ত দল ও রুদ্ধ দল উভয়েরই মাপ এক মাত্রা। যেমন : 'নিরুদ্দেশ' এই রীতিতে নি/রুদ্/দেশ্ = ৩ মাত্রা। আর এক ধরনের ছন্দে মুক্ত দল একমাত্রা হলেও রুদ্ধদল দুই মাত্রা। যেমন: নি/রু/দ্/দে/শ্ = ৫ মাত্রা। তৃতীয় আর এক ধরনের ছন্দে মুক্ত দল এক মাত্রা হলেও শব্দের শেষের রুদ্ধ দল দুই মাত্রা। কিন্তু শব্দের ভেতরকার রুদ্ধদল একমাত্রা, যেমন: নি^{১} রুদ্^{১} দেশ^{২} (এখানে 'রুদ' রুদ্ধ দল হলেও শব্দের মাঝখানে আছে তাই একমাত্রা, কিন্তু রুদ্ধদল 'দেশ' শব্দের শেষে আছে বলে এর দুই মাত্রা) কাজেই বোঝা যাচ্ছে মুক্ত দলের মাত্রা সব ধরনের ছন্দেই একরকম হলেও রুদ্ধ দলের মাপ এক এক ছন্দে এক এক রকম। রুদ্ধ দলের মাত্রা তিন ধরনের ছন্দে তিন রকমের হয় বলে ছন্দবিজ্ঞানীরা বাংলা ছন্দরীতিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।

১) প্রথম রীতির ছন্দটির নাম দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান:

যেমন,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান = ৪+৪+৪+১

শব্দার্থ ও টীকা

বিষ্টি = বৃষ্টি।
নদেয় = নদীতে।
কন্যে = কন্যা।
সিনান = স্নান।
এলো = খোলা।

১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১ ১১ ১
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান = ৪+৪+৩+১

২) দ্বিতীয় রীতির ছন্দটির নাম কলাবৃত্ত বা ধ্বনি প্রধান:

যেমন,

১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
সা-গর জলে সি-নান ক-রি স-জল এ-লো চুলে = ৫+৫+৫+২

১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
ব-সিয়া ছি-লে উপল উ-প কূলে = ৫+৫+২

৩) তৃতীয় রীতির ছন্দটির নাম কলাবৃত্ত বা তান প্রধান:

যেমন,

১ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ১ ১
রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে = ৮+৬

১ ১ ২ ২ ২ ২ ২ ১ ১
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে = ৮+৬

বাংলা ছন্দের এই তিন ধরনের মূল রীতিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন কবি ছন্দের ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে প্রধান। তিনি গদ্য ছন্দের কবিতাও লিখেছেন। একে বলে গদ্য কবিতা। রবীন্দ্রনাথের পরে আরও অনেকে গদ্য কবিতা লিখেছেন। আপনাদের পাঠ্য বইয়ে 'নাজমা' কবিতাটি এই রকম গদ্য কবিতার উদাহরণ।

পাঠগত প্রশ্ন 1.1

ক) দুদিকের অংশ ঠিকমতো যোগ করুন

(১) ছন্দ হচ্ছে	(i) একটি গদ্য কবিতা।
(২) মাত্রার পরিমাণ নির্ভর করে	(ii) শব্দের দল অনুযায়ী
(৩) দল হচ্ছে	(iii) ছন্দ তিন প্রকার।
(৪) ধরন অনুযায়ী	(iv) নির্দিষ্ট মাপের ধ্বনি অনুযায়ী কবিতার সাজানো বাক্য।
(৫) 'নাজমা' হচ্ছে	(v) এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত শব্দের অংশ।

1.4 খ) অলংকার

কাব্যকে কবি নানাভাবে সাজিয়ে তোলেন। তখন কাব্য হয়ে ওঠে রূপময়। কাব্যকে সাজিয়ে তোলার জন্য যে সব সাজসজ্জার ব্যবহার করা হয় সেগুলিকেই বলা হয় অলংকার। কাব্যে অলংকার গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যে সৌন্দর্য সৃষ্টির সব উপাদানকেই অলংকার বলা হয়েছে। বাক্যকে শব্দ ও অর্থ দিয়ে সাজিয়ে দিলেই কাব্য হয় না। এইজন্য কাব্যের বাক্যে দুভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি বা অলংকার প্রয়োগ করা হয়। ১) কাব্যের শব্দ ব্যবহারের

শব্দার্থ ও টীকা

মধ্যে, (২) বাক্যের অর্থবিস্তারের মধ্যে। এজন্য অলংকার দুই শ্রেণির: শব্দালংকার ও অর্থালংকার।

শব্দের সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য যে অলংকার ব্যবহার করা হয় তাকে বলে শব্দালঙ্কার। যেমন:

'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে'।

এখানে 'গ' ধ্বনিটি বিভিন্ন শব্দের মধ্য দিয়ে বার বার ঘুরে ঘুরে এসে একটা ধ্বনি-সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। এই সৌন্দর্য শব্দের বিশেষ কৌশলী প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। এজন্য এখানে শব্দালংকারের প্রয়োগ ঘটেছে। এই শব্দালংকারের নাম **অনুপ্রাস**। অনুপ্রাস ছাড়া আরও দুটি বিশিষ্ট শব্দালংকার **শ্লেষ** ও **যমক**।

শ্লেষ— কবি যখন বিভিন্ন অর্থে একই শব্দ প্রয়োগ করেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে পাঠকও বিভিন্ন অর্থে শব্দটিকে গ্রহণ করেন তখন শ্লেষ অলংকার। যেমন :

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর
(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা)

এখানে ঈশ্বর কবির নাম ও ভগবান এই দুই অর্থে বোঝাচ্ছে। প্রভাকরেরও দুই অর্থ ১) সূর্য ২) ঈশ্বর গুপ্ত।

যমক— দুই বা তার বেশি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরধ্বনি সমেত নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থকভাবে ব্যবহৃত হলে হয় যমক অলংকার। যেমন, 'ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে'। এখানে প্রথম 'ভারত' কবি ভারতচন্দ্র, দ্বিতীয় 'ভারত' ভারতবর্ষ।

অর্থালঙ্কার— যে অলংকার একান্তভাবেই অর্থের উপর নির্ভর করে এবং কাব্যের শব্দগুলিকে পরিবর্তিত করে সেখানে অন্য সমার্থক শব্দ বসিয়ে দিলেও যে অলংকার একই থাকে তার নাম অর্থালংকার।

যেমন: 'গৌর নাগর রসের সাগর
ভাবের তরঙ্গ তায়' — উদ্ধবদাস

এখানে গৌরাঙ্গ দেবকে সাগর ও তাঁর ভাবলীলাকে সাগরের তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যার তুলনা করা হয় তাকে বলে **উপমেয়**। আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে বলা হয় **উপমান**। যেখানে উপমেয় ও উপমানকে অভিন্ন মনে করা হয় সেখানে **রূপক অলংকার** হয়। অলংকারের বর্তমান উদাহরণটিও রূপক অলংকারের।

যেমন : 'মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে।'

এখানে উপমেয় 'মন'-এর সঙ্গে উপমা 'মাঝি'র তুলনা করা হয়েছে।

পাঠগত প্রশ্ন : 1.2

ক) ঠিক উত্তর আলোচিত অংশ থেকে বেছে নিয়ে লিখুন

(১) কাব্যে অলংকার হল .....।

(২) অলংকার শাস্ত্র হচ্ছে .....।

শব্দার্থ ও টীকা

(৩) যমক অলংকার হচ্ছে .....।

(৪) উপমেয় হচ্ছে .....।

খ) উত্তর দিন

(১) শব্দশ্লেষের উদাহরণ দিন।

(২) উপমানের উদাহরণ দিন।

1.5 গ) চিত্রকল্প

কবি তাঁর কল্পনায় শব্দ ও বাক্যের সম্ভারে সাধারণকে অসাধারণ রূপময় করে তোলেন। ভাবকে রূপময় করে তোলার জন্য কবি দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন (১) উপমা বা উপমেয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক অলংকার প্রয়োগ (২) চিত্রকল্পের প্রয়োগ যা অলংকারের মতো সাদৃশ্যধর্মী হয়েও অলংকারের চেয়ে আরো গভীর ও তাৎপর্যময়। যখন সরু ও টানা টানা চোখের সৌন্দর্য বর্ণনা করার জন্য বলা হয় পটোল-চেরা চোখ, তখন শুধু চেরা-পটোলের বাইরের আকারের সঙ্গে সাদৃশ্য বোঝানো হয়। এতে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে তা সাদৃশ্যমূলক অলংকার প্রয়োগের ফলে। এতে শুধু ছবি আছে, কিন্তু গভীর কোনো ব্যঞ্জনা নেই। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ যখন বলেন,

পদ্ধতি = রীতি, উপায়।
সাদৃশ্য = মিল।

> 'সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর
> তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
> পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।'

ব্যঞ্জনা = রীতি, উপায়।
সাদৃশ্য = ভাব।

নীড় = বাসা।

এই ব্যঞ্জনা অলংকার থেকে আসে নি, এসেছে আরও তাৎপর্যময় এক ছবির মধ্যে দিয়ে। এই ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্রই হচ্ছে কবিতার চিত্রকল্প। তখন কবি চোখের সঙ্গে পাখির নীড় বা বাহ্য আকারের সাদৃশ্য বোঝান না, বোঝান বনলতা সেনের চোখের মধ্যে পাখির নীড়ের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের ব্যঞ্জনা।

পাঠগত প্রশ্ন : 1.3

ক) একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) ভাবকে রূপময় করে তোলার জন্য কবি কটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন?

(২) 'পাখির নীড়ের মতো চোখ'— কবিতাংশটি কোন্ অলংকারের উদাহরণ?

(৩) বনলতা সেনের চোখে পাখির নীড়ের কীসের ব্যঞ্জনা রয়েছে?

(৪) বনলতা সেন কবিতাটি কার লেখা?

খ) শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান।

(১) ভাবকে রূপময় করার জন্য কবি যে পদ্ধতি দুটি অবলম্বন করেন সেগুলির নাম (i) ..... (ii) .....

(২) 'কাশীরাম দাস' কবিতাটি ..... -এর উদাহরণ।

1.6 বাংলা কবিতার প্রাচীন ও মধ্যযুগ

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা কাব্যধারায় মূলভাব ছিল ভক্তিবাদ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য 'চর্যাপদ' বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধর্মসাধনার সংগীত। খ্রিষ্টীয় দশম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা এই চর্যাগীতিগুলি রচিত। 'চর্যাপদ'ই আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন। বৌদ্ধ সাধকদের সাধন প্রণালী ও দর্শন তত্ত্ব নানা ধরণের রূপক, প্রতীক ও চিত্রকল্পের আভাষে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। আবার বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ— গাছ, নদী, আকাশ, ফুল, ফল, বাংলার তখনকার সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা, তাদের পোশাক-আশাক, অলংকার, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত খাদ্য, বাসনপত্র, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। তবে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ ডোম-শবর-শুঁড়ি প্রভৃতি মানুষের জীবনযাত্রাই প্রাধান্য পেয়েছে চর্যার পদে।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্য দুটি ধারায় প্রবাহিত।

(ক) আখ্যানকাব্য, (খ) খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্য। আখ্যানকাব্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্য, চরিত সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য প্রধান। গীতিকাব্যের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলি, শাক্ত পদাবলি ও বাউলগান অন্তর্গত।

নীচে একটি ছকে আখ্যানকাব্যের বিষয়গত বিভাজনটি দেখান হল—

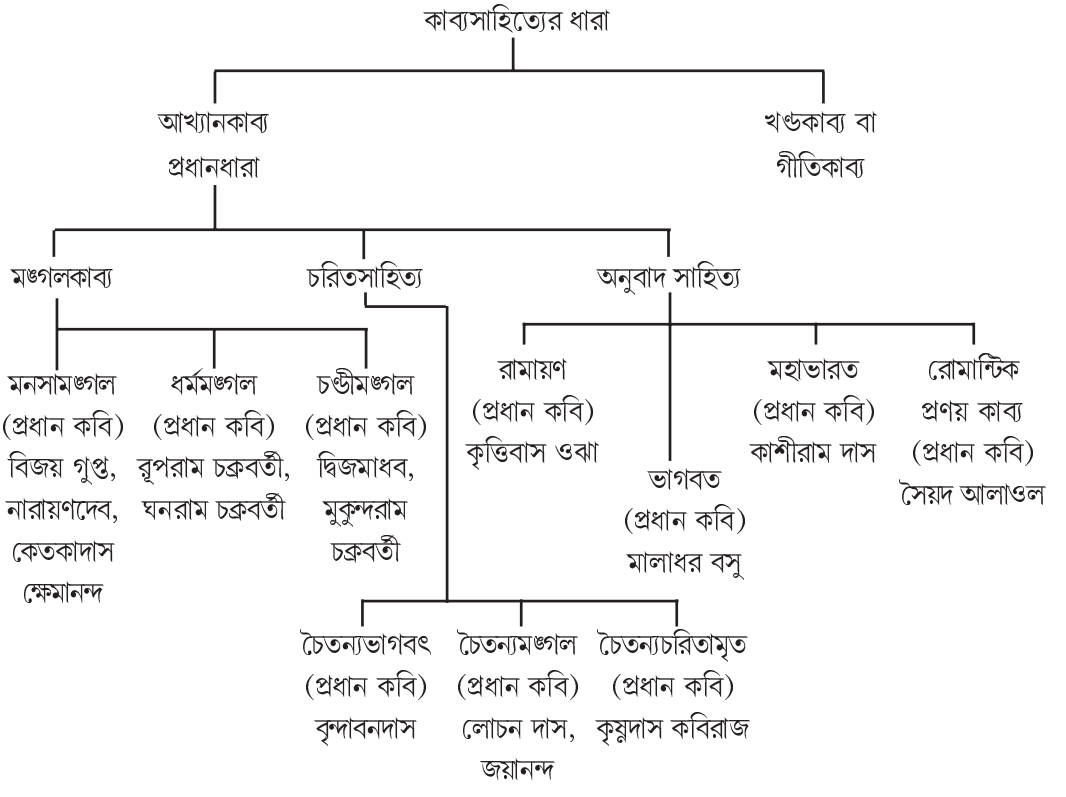

ক) আখ্যানকাব্য :

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় শাখা হল আখ্যানকাব্য। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এর কালপর্ব। যে কাব্য আখ্যান অর্থাৎ কাহিনিনির্ভর তাকে আখ্যানকাব্য বলে। আখ্যানকাব্য কাহিনিপ্রধান। কাহিনি বড়োও হতে পারে আবার ছোটোও হতে পারে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী। বিপদে ভক্তকে উদ্ধার

শব্দার্থ ও টীকা

করেন। যাঁরা দৈব নির্দেশ অমান্য করেন তাঁদের কপালে জোটে দারুণ দুর্ভোগ। নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে মর্তবাসীরা ঐ আরাধ্য দেবতা বা দেবীর অলৌকিক মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন, তারপর ভক্তের মধ্য দিয়ে তাঁর পূজা প্রচার ও বিজয়গাথা বর্ণনা করে তিনি স্বর্গে ফিরে যান। প্রতিভাবান কবিদের লেখনীতে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব। বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গলের রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গলের এবং দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলের বিখ্যাত কবি।

আখ্যানকাব্য ধারায় অনুবাদ সাহিত্যের শাখাটিও বড় স্থান দখল করে আছে। বাংলার লোকসাধারণের জন্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থের অনুবাদ শুরু হয়। তবে এগুলি বাংলার লোকসংস্কৃতির সাথে মিশে যাওয়ার জন্য কবিরা আক্ষরিক অনুবাদ করলেন না, করলেন ভাবানুবাদ। এই অনুবাদ সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য ভক্তিবাদ। কৃত্তিবাস 'রামায়ণ'-এর, কাশীরাম দাস 'মহাভারত' এবং মালাধর বসু 'ভাগবত'-এর শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। এছাড়া ইসলামি শাসনকর্তাদের আনুকূল্যে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন ভাষায় লেখা রোমান্টিক প্রণয়কাব্য বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। যেমন, পঞ্চদশ শতকে গৌড় দরবারের অনুগ্রহপ্রাপ্ত কবি শাহ মুহম্মদসগীর 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের অনুবাদ। সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভার কবি সৈয়দ আলাওল 'পদ্মাবতী' অনুবাদ করেন। আপনাদের পাঠ্য বইতে 'পদ্মাবতী' কাব্যের একটি অংশ সংকলিত হয়েছে।

আখ্যানকাব্য ধারার অন্যতম একটি শাখাচরিত কাব্য। বাংলা ভাষায় চরিত সাহিত্য ধারার উৎস চৈতন্যদেব। যুগনায়ক চৈতন্যদেব প্রেম, ভক্তি দিয়ে বাংলাদেশে এক ভাব বিপ্লবের সূচনা করলেন। তাঁর মানবপ্রেমের মূলকথা কৃষ্ণভক্ত অচ্ছুত চণ্ডালও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণতুল্য হতে পারে। চৈতন্যের ব্যক্তি চরিত্রের মহিমা বর্ণনা সাহিত্যে তথ্যনিষ্ঠ সমাজ দর্শন ও ইতিহাস চেতনার সূত্রপাত ঘটাল। চৈতন্যচরিতকাব্য মূলত ভক্তির কাব্য। তাঁর চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাব্য রচনা করলেও সেখানে মহাপ্রভুর বংশ পরিচয়, বাল্যজীবন, কৈশোর, যৌবন, বিবাহ, সন্ন্যাস প্রভৃতি জীবনবৃত্তান্ত কাব্যে স্থান পেয়েছে। দেবদেবী অধ্যুষিত অলৌকিক বাংলা সাহিত্য জগতে চৈতন্যচরিত সাহিত্য নতুন প্রবণতার সৃষ্টি করল। বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' লোচনদাস ও জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেন। এগুলি সবই চরিত-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

অধ্যুষিত = অধিষ্ঠিত, অধিবাসীযুক্ত।

পাঠগত প্রশ্ন : 1.4

ক) একটি দুটি শব্দে উত্তর দিন :

(১) প্রাচীন যুগের কাব্যের মূল ভাব কী ছিল?

(২) চর্যাপদ কীসের নিদর্শন?

(৩) আখ্যান কাব্য রচনার সূচনা পর্বটি কবে ঘটে?

(৪) বাংলা সাহিত্যে অনুবাদকর্ম কখন শুরু হয়?

(৫) বাংলায় চরিত-সাহিত্যের উৎস কে?

(৬) মঙ্গলকাব্যধারার দুজন প্রধান কবির নাম লিখুন।

1.7 খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য

গীতিকাব্য হল গীতিমূলক ছোটো কবিতা, যার মধ্যে ধারাবাহিক কাহিনি নেই। গীতিময়তা এই কবিতার প্রাণ। মধ্যযুগের গীতিকাব্যের ধারা মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত। বৈষ্ণবপদাবলি, শাক্ত পদাবলি ও বাউলগান। এই তিনটি ধারা নানা ভাবে প্রবাহিত, পরবর্তী পৃষ্ঠায় তা একটি ছকে দেখান হল—

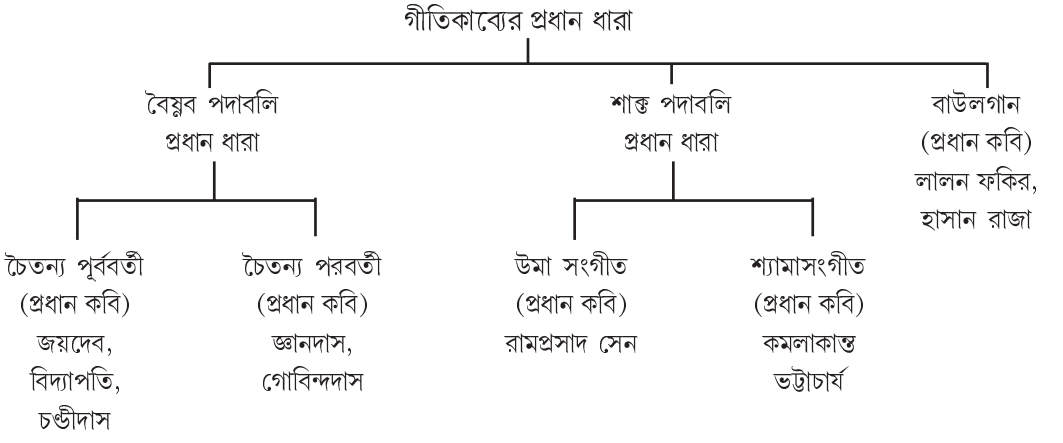

বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম। গীতিময়তা বৈষ্ণব পদাবলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানব হৃদয়ের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি, উৎকণ্ঠা, প্রেম মাধুর্য, অতীন্দ্রিয় জীবন বোধ, রোমান্টিক ভাববিহ্বলতা, পাওয়া না-পাওয়ার, মিলন বিরহের আনন্দ-বেদনা বৈষ্ণব পদাবলিতে ফুটে উঠেছে। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যকে চৈতন্যপূর্ব এবং চৈতন্য পরবর্তী দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব কবিদের পদাবলি ছিল মানব-মানবীর লৌকিক প্রেমকাহিনি। চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলির স্বরূপটি আলাদা। চৈতন্য পরবর্তী কবিতা চৈতন্যলীলার প্রভাবে ঐশ্বর্যময়। চৈতন্য ভক্তরা বিশ্বাস করতেন মহাপ্রভু অন্তরে কৃষ্ণ, বাইরে রাধা, ফলে চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণবপদাবলি সাহিত্যে আসে ভাবের নবরূপায়ণ। বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শন নতুন করে গড়ে ওঠে। চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা সকলেই ভক্ত, তাঁরা রাধাকৃষ্ণের উপাসক। তাই রাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদনই হল কাব্যের বিষয়। চৈতন্য পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব কবি হলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস। চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব কবি বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস উল্লেখযোগ্য।

গীতিকাব্য ধারার উল্লেখযোগ্য শাখা হল শাক্ত পদাবলি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানাপ্রকার আঘাতে জনজীবন বিপর্যস্ত। এই ঘোর দুর্দিনে শাক্তকবিরা অনন্ত-শক্তিময়ী 'কালভয়হারিনী' বরাভয়দাত্রী জগজ্জননীর কাছে উদ্ধারের প্রতিকার চাইলেন। কালীকে শাক্তকবিরা কোমলে কঠোরে রূপ দিলেন। তিনি হলেন মা। কালী মাতৃরূপে আরাধিত হলেন। এতে ভক্তিভাবের প্রাধান্য। কালীমাতা বা শ্যামা মাকে নিয়ে রচিত হল শ্যামাসংগীত। আবার শাক্ত পদাবলি উমাসংগীতে কালী বাঙালির ঘরের কন্যারূপে চিত্রিত। আগমনি ও বিজয়া বিষয়ক শাক্তগীতিতে মাতৃহৃদয়ের স্নেহ, বাৎসল্য ফুটে উঠেছে। শাক্ত কবিরা বাঙালি জাতির বাস্তব জীবন ও ঘরসংসারের সুখ-দুঃখের ছবি এঁকেছেন তাঁদের কবিতায়। সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শ্যামাসংগীত এবং রামপ্রসাদ সেন উমাসংগীত রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 1.5

যেটি ঠিক সেটি বেছে নিন :

(১) মধ্যযুগের গীতিকাব্য কটি ভাগে বিভক্ত? (দুটি / তিনটি / চারটি)

(২) বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়বস্তু কী? (রাধাকৃষ্ণের প্রেম / সাধকদের সাধনা / মুক্তির সাধনা)

(৩) শাক্ত পদাবলি কোন যুগের? (আদি যুগের / মধ্য যুগের / আধুনিক যুগের)

1.5 ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বাংলা কাব্য

অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে বাংলা কাব্য আধুনিকতার পথে পা বাড়ায়। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা কাব্যের রূপটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের কাব্যধারা দুটি পর্বে বিভক্ত। (১) ইংরেজ শাসন পর্ব, (২) স্বাধীনতা উত্তর বা রবীন্দ্রোত্তর পর্ব। এই দুই পর্বে বাংলা কবিতা নানা ধারায় প্রবাহিত। উপরিউক্ত বাংলা কাব্যধারার ছকটি নীচে করে দেখানো হল—

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা কাব্য

- ইংরেজ শাসন পর্ব
- স্বাধীনতা উত্তর বা রবীন্দ্রোত্তর পর্ব

ইংরেজ শাসন পর্বে বা নবজাগরণের পূর্বে রচিত বাংলা কবিতায় দেখা গেছে মধ্যযুগের ধারার অনুবর্তন। কবিতায় কবির কল্পনায়, ভাবনায় আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যটি উল্লিখিত ছিল না। ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো বাঙালির চিন্তাজগতে আনে নব চেতনা। সেই চেতনার আলো পড়ে কবিদের কাব্যে এবং সাহিত্যে। বাংলা কবিতা মধ্যযুগের পয়ার, ত্রিপদী ছেড়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে আখ্যানকাব্য রচনা শুরু হয়। নতুন স্বাদের সনেট বাংলা কবিতায় নতুনত্ব আনে। নবচেতনার আলোয় কবিরা মহাকাব্য লিখে বাংলা কবিতাকে অন্য মাত্রা দিলেন। আবার রবীন্দ্র পরবর্তী বা স্বাধীনতা উত্তর কবিরা সাহিত্যে আনেন নতুনত্বের স্বাদ। রবীন্দ্রপর্ব এবং রবীন্দ্রপরবর্তী পর্বে রবীন্দ্রধারার অনুগামী কিছু কবির পাশাপাশি কিছু রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত কবি সাহিত্যকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেন। আবার রবীন্দ্র-নিরপেক্ষভাবে কোনো কোনো কবি নিজস্ব শৈলীতে কাব্য রচনা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মানবিক মূল্যবোধের সঙ্কট প্রতিফলিত হয় অনেকের কাব্যে। জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র এই ধারার উল্লেখযোগ্য কবি। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা কাব্য-ধারার বিভাজনটি ছকে দেখানো হল—

ইংরেজ শাসনপর্ব ও স্বাধীনতা উত্তর বা রবীন্দ্রোত্তর পর্বের কাব্যধারা

- আখ্যানকাব্য
  - উদাহরণ
  - পদ্মিনী উপাখ্যান (রঙ্গলাল)
  - তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (মধুসূদন দত্ত)
  - পলাশীর যুদ্ধ (নবীনচন্দ্র সেন)
- মহাকাব্য
  - মেঘনাদবধ কাব্য (মধুসূদন দত্ত)
  - বৃত্রসংহার (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)
  - রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস (নবীনচন্দ্র সেন)
- গীতিকবিতা (লিরিক)
  - রবীন্দ্রপূর্ব
    - বিহারীলাল চক্রবর্তী
    - দেবেন্দ্রনাথ সেন
    - সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
    - মানকুমারী বসু
    - গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
  - রবীন্দ্র রচনা
    - প্রথমকাব্য 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২ খ্রি:)
    - শেষকাব্য 'শেষ লেখা' (১৯৪১ খ্রি:)
    - (এই কাব্যধারা নানা পর্বে বিভক্ত)
  - রবীন্দ্র অনুগামী
    - কালিদাস রায়
    - কুমুদরঞ্জন মল্লিক
    - করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
    - যতীন্দ্রমোহন বাগচি
    - প্রভৃতি
  - রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্ন ভাবনার কবি
    - কাজী নজরুল ইসলাম
    - যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
    - বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র
    - জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
    - সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সন্ধিক্ষণ = এককালের অবসান ও অন্যকালের আগমনের সময়

শব্দার্থ ও টীকা

সনেট = চতুর্দশপদী কবিতা

শব্দার্থ ও টীকা

উনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা কাব্যধারা প্রধানত তিনটি খাতে প্রবাহিত। সেগুলি হল উল্লিখিত (ক) আখ্যানকাব্য, (খ) মহাকাব্য ও (গ) গীতিকবিতা।

ক) আখ্যানকাব্য :

আখ্যানকাব্য কাহিনিমূলক কাব্য। কাহিনিই প্রধান। তবে উনিশ শতকের আখ্যানকাব্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্যকথার বদলে এল মানুষের নিজের জীবনকথা। বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকে আখ্যানকাব্যের প্রথম রচয়িতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী' প্রভৃতি কাব্যগুলি তাঁর লেখা। অন্যান্য আখ্যানকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লেখা আখ্যানকাব্য হল 'আশাকানন', 'বীরবাহু' প্রভৃতি। নবীনচন্দ্র সেনের উল্লেখযোগ্য আখ্যানকাব্য হল— 'পলাশীর যুদ্ধ'।

খ) মহাকাব্য :

উনবিংশ শতকে আর-এক শ্রেণির আখ্যানকাব্য রচিত হল যা মহাকাব্য। মহাকাব্য দুই শ্রেণির হয়। (১) আর্য বা প্রাচীন মহাকাব্য, (২) আলংকারিক বা সাহিত্যিক মহাকাব্য। প্রাচীন বা আর্য মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য হল এই শ্রেণির মহাকাব্যের মধ্যে সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে।

বৈশিষ্ট্য:

পটভূমি = অধ্যায়
সর্গ = অধ্যায়

মহাকাব্যের কাহিনি হবে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক। নায়ক হবে সদ্‌গুণের অধিকারী। কাহিনির পটভূমি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল। মহাকাব্যে আটটি সর্গ থাকবে। বীররস প্রধান। পৃথিবীতে এই ধরনের মহাকাব্য বাল্মিকীর 'রামায়ণ', ব্যাসদেবের 'মহাভারত', গ্রীসের হোমারের লেখা 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি'। উনবিংশ শতকে বাংলায় মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখলেন আলংকারিক মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ'। রামায়ণের কাহিনি নিয়ে রচিত, নয়টি সর্গে বিভক্ত। মহাকাব্য হিসেবে 'মেঘনাদবধ' বাংলা কাব্য ধারার বিষয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। এই ধারার অন্যান্য কাব্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার কাব্য', নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রাভাস'।

গ) গীতিকাব্য :

ইংরেজিতে যাকে লিরিক বলা হয়, বাংলায় তাকে বলা হয় গীতিকবিতা। গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ। মধ্যযুগের গীতিধর্মী খণ্ড কবিতার সঙ্গে এর মিল হল, এই কবিতাও খণ্ড কবিতার মতো আকারে ছোটো। কিন্তু সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মধ্যযুগের খণ্ড কবিতার থেকে আধুনিক গীতিকবিতার পার্থক্য বেশি। মধ্যযুগের পদাবলির মতো খণ্ডকবিতার থেকে আধুনিক গীতিকবিতার পার্থক্যটাই বেশি। মধ্যযুগের পদাবলির মতো খণ্ডকবিতায় কবির ধর্মীয় অনুভূতি গানের সুরে ধরা পড়ত। কিন্তু আধুনিক গীতিকবিতা গাওয়ার জন্য রচিত নয়। কবির নানা ব্যক্তিগত অনুভূতিই এখানে প্রকাশ পায়। বিহারীলাল চক্রবর্তীর লেখনীতে আধুনিক গীতিকবিতা রচনার সূত্রপাত। তাঁর 'নিসর্গসন্দর্শন', 'সাধের আসন', 'সারদামঙ্গল' এই ধারার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ', 'বঙ্গভূমির প্রতি', প্রভৃতি কবিতাগুলি গীতিরসে পূর্ণ। এছাড়া দেবেন্দ্রনাথ সেনের লেখা 'ফুলবালা', 'ঊর্মিলাকাব্য' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ গীতিকবিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দ্বিজেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার বড়াল, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গীতিকবিতা লিখেছেন।

বিংশ শতকে গীতিকাব্যের ধারাটি এখনও বয়ে চলে আসছে কবিদের লেখায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনবিংশ ও বিংশ শতকে এই দুই ধারার গীতিকবির সার্থক উত্তর সাধক। 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 1.6

ক) নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) কোন্ সময় থেকে বাংলা কাব্যের রূপটি পরিবর্তিত হয়ে যায়?

(২) ঊনবিংশ শতকে বাংলা কাব্য ধারাগুলি উল্লেখ করুন।

(৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কাব্যে কীসের প্রতিফলন ঘটে?

(৪) আখ্যানকাব্য ধারার উনিশ শতকের প্রথম রচয়িতা কে?

(৫) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি মহাকাব্যের নাম লিখুন।

খ) শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান :

(১) 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্যদুটি লিখেছেন .....।

(২) মধুসূদন দত্তের লেখা মহাকাব্যটির নাম .....।

(৩) বিহারীলাল ছাড়া দুজন গীতিকবির নাম (১) ..... (২) .....।

(৪) দুজন মহিলা গীতিকবির নাম (১) ..... (২) .....।

1.9 আপনি যা শিখলেন

1. কবিতা কী এবং কবিতার সংজ্ঞা;
2. যথাযথ শব্দ চয়ন বা ধ্বনি-বিন্যাস বাক্যকে কাব্যে পরিণত করে;
3. কবিতায় ছন্দ ও অলংকার কবিতাকে গতিময় ও সৌন্দর্যে ভরে তোলে;
4. চিত্রকল্পের সাহায্যেও কবিরা ভাবটি ফুটিয়ে তোলেন;
5. প্রাচীন যুগের কাব্য সম্পর্কে জ্ঞান;
6. মধ্যযুগের কাব্য ও কাব্যের রীতি সম্পর্কে জ্ঞান;
7. প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবি ও কাব্য সম্পর্কে জ্ঞান;
8. আধুনিক যুগের কবি ও কাব্য সম্পর্কে জ্ঞান;
9. মহাকাব্যের রূপটি জানতে পারা;
10. গীতিকাব্য সম্পর্কে ধারণালাভ।

শব্দার্থ ও টীকা

1.10 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলির অনধিক ৬ থেকে ৮টি বাক্যে উত্তর দিন :

1. কবিতা কী? কবিতা পড়তে গেলে কবিতার কোন্ কোন্ দিকে দৃষ্টি দিতে হয়?
2. কবিতায় ছন্দের গুরুত্ব কতখানি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।
3. কবিতার অলংকার কীভাবে ব্যবহৃত হয় একটি দৃষ্টান্ত সহযোগে লিখুন।
4. অলংকারের সঙ্গে চিত্রকল্পের তফাত কোথায় উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।
5. কবি কীভাবে ভাবকে চিত্ররূপ দান করেন লিখুন।
6. চর্যাপদে সমকালীন বাংলার সম্বন্ধে কী জানা যায়?
7. সাহিত্যের কোন ধারা অবলম্বন করে মধ্যযুগের কাব্য প্রবাহিত হয় লিখুন।
9. বাংলা অনুবাদ কাব্যের বৈশিষ্ট্য কী?
10. কাকে অবলম্বন করে চরিতকাব্য লিখিত হল?
11. মধ্যযুগের গীতিকাব্যধারায় চৈতন্য-পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদাবলির বৈশিষ্ট্য লিখুন।
12. শাক্ত পদাবলির বৈশিষ্ট্য লিখুন।
13. ঊনবিংশ শতকে রচিত মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

1.11 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

1.1 ক) (১) (iv)

(২) (ii)

(৩) (v)

(৪) (iii)

(৫) (i)

1.2 ক) (১) কাব্যকে সাজিয়ে তোলার জন্য সাজসজ্জা।

(২) অলংকার সম্বন্ধীয় শাস্ত্র।

(৩) দুভাবে।

(৪) শব্দালংকার।

(৫) যার তুলনা করা হয়।

খ) (১) কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর / যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

শব্দার্থ ও টীকা

(২) যার সঙ্গে তুলনা করা হয়।

1.3 ক) (১) দুটি।

(২) চিত্রকল্পের।

(৩) নিশ্চিন্ততার ব্যঞ্জনা।

(৪) জীবনানন্দ দাশ।

খ) (১) (i) উপমা ও উপমেয়-র সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক অলংকার।
(ii) চিত্রকল্প।

(২) গীতিকবিতা।

1.4 (১) ভক্তিবাদ।

(২) প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধর্মসাধনার সঙ্গীত।

(৩) পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত।

(৪) মধ্যযুগে।

(৫) চৈতন্যদেব।

(৬) বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব।

1.5 (১) তিনটি।

(২) রাধাকৃষ্ণের প্রেম।

(৩) মধ্যযুগের।

1.6 ক) (১) ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে।

(২) ১. রবীন্দ্রপর্ব ২. রবীন্দ্রোত্তর পর্ব।

(৩) মানবিক মূল্যবোধের সংকট।

(৪) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৫) বৃত্র সংহার।

খ) (১) হোমার।

(২) মেঘনাদবধ।

(৩) দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ।

(৪) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়।

1.12 সমধর্মী গ্রন্থ

1. সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি - উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
2. ছন্দ সোপান - প্রবোধচন্দ্র সেন
3. অলঙ্কার চন্দ্রিকা - শ্যামাপদ চক্রবর্তী

শব্দার্থ ও টীকা

2

রাধার কী হৈল অন্তরে ব্যথা

চণ্ডীদাস

2.1 প্রস্তাবনা

রাস ও দোলযাত্রা আমাদের পরিচিত উৎসব। এই উৎসবগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাধা-কৃষ্ণের ভালোবাসার কাহিনি। রাধার কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা সবে শুরু হচ্ছে— এই সময়ের কথা কবিতায় আছে। রাধা-কৃষ্ণের ভালোবাসা যখন আরম্ভ হচ্ছে সেই অবস্থাকে বলা হয় পূর্বরাগ। পূর্বরাগ পর্বে রাধার মনের অবস্থা কী রকম, পঞ্চদশ শতকের কবি চণ্ডীদাস আমাদের তা জানিয়েছেন। মনের খবর প্রকাশ পায় আচরণের মধ্যে দিয়ে। এই কবিতায় বা পদে রাধার প্রত্যেক আচরণ তাঁর মনের বিশেষ অবস্থাকে প্রকাশ করছে।

রাধার অনেক সখী। তাঁরা রাধার একান্ত আপনজন। রাধার অবস্থা দেখে সখীরা বিচলিত। পদটিতে সখীমুখে ব্যক্ত হয়েছে রাধার আচরণ।

বিচলিত = চঞ্চল

পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ। মধ্যযুগের কবিতার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য আলোচ্য পদে দেখা যাবে। যেমন 'হইল' হয়েছে 'হৈল', 'ধ্যান' হয়েছে 'ধেয়ান'। কবিতাটিতে কমা (,), সেমিকোলন (;), প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) ইত্যাদি যতিচিহ্ন নেই। যতিচিহ্ন যা আছে তা হল এক-দাঁড়ি(।) এবং দু-দাঁড়ি (।।)। (।।।) এযুগে কবিতার শেষ অংশে বা ভনিতায় কবি নিজের নাম জানিয়ে দিতেন। চেষ্টা করলে এইরকম আরও বৈশিষ্ট্য আমরা খুঁজে বার করতে পারি।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি :

- পুরোনো দিনের (মধ্যযুগের) কবিতা কেমন হত তা জানাতে পারবেন;
- রাধার কোন্ আচরণ মনের কোন্ বিশেষ অবস্থা প্রকাশ করছে তা বোঝাতে পারবেন;
- রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের 'পূর্বরাগ' পর্যায় সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- মধ্যযুগের কবিরা কীভাবে নিজেদের নাম জানাতেন তা বোঝাতে পারবেন।

2.3 মূল পাঠ

2.3.1

(1)

রাধার কী হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমত যোগিনী-পারা।।

(2)

এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ-পানে
কী কহে দুহাত তুলি।।
একদিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া-বঁধুর সনে।।

শব্দার্থ ও টীকা

বিরলে = নির্জনে।
থাকয়ে একলে = একলা থাকে।
ধেয়ানে = ধ্যানে।
নয়ান-তারা = চোখের তারা।
রাঙ্গা বাস = লাল বসন।
যোগিনী = তান্ত্রিক সাধিকা।
পারা = মতো

দেখয়ে = দেখে।
খসায়ে চুলি = চুল এলো করে।
হসিত বয়ানে = হাসিমুখে।
একদিঠ করি = একদৃষ্টিতে।
করে নিরীক্ষণে = একমনে দেখে।
বঁধু = বন্ধু।
কালিয়া-বঁধুর = বন্ধু কৃষ্ণের। কৃষ্ণের গায়ের রং ছিল কালো। তাই তাঁকে ডাকা হত কালা বা কালিয়া বলে।
সনে = সঙ্গে।

2.4 বিষয়ের রূপরেখা

2.4.1 রাধার কী হৈল . . . যোগিনী পারা।।

গদ্যরূপ :

রাধার অন্তরে কীসের ব্যথা? তিনি বিরলে একলা বসে আছেন, কারও কথা তিনি শুনছেন না। সব সময় মেঘের দিকে চেয়ে ধ্যান করছেন, তাঁর নয়ন-তারা নিশ্চল। তিনি আহারে বিরত। তিনি যোগিনীর মতো রাঙা বাস পরে আছেন।

2.4.2 বক্তব্যসার :

সখীরা রাধার বেদনার কারণ খুঁজছেন। তাঁরা খুঁটিয়ে দেখছেন রাধার আচরণ। কারও কথা রাধা শুনতে পাচ্ছেন না। এই ঘটনা বুঝিয়ে দিচ্ছে, নিজের ভাবনার মধ্যে গভীরভাবে তিনি ডুবে আছেন। কৃষ্ণ কালো, মেঘও কালো। তাই মেঘের কালো রং তাঁর মন টেনেছে। যোগিনীরা বা তান্ত্রিক সাধিকারা ধ্যান করেন তাঁদের ইষ্টদেবতার।

রাধাও ধ্যানে দেখছেন তাঁর একান্ত প্রিয়জনকে। রাধার প্রিয় বসন নীলাম্বরী, সেই বসন ত্যাগ করে তিনি পরেছেন রক্তবাস। মনে করা হয়, অনুরাগের রং রাঙা। রাধার রাঙা বসনে সেই অন্তরের রঙের আভাস।

পাঠগত প্রশ্ন 2.1

(১) শূন্যস্থান পূরণ করুন:

ক) রাধার কী ..... অন্তরে .....।

খ) বিরতি .... বাস পরে
যেমত .....।।

(২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন:

ক) রাধা কী অবস্থার মধ্যে বসে আছেন?
(একা / নির্জনে / সখীদের সঙ্গে / সজনে)

(৩) একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দিন:

ক) রাধা কোন্ দিকে চেয়ে আছেন?

খ) রাধা কেমন বস্ত্র পরেছেন?

গ) রাধা কাদের মতো বস্ত্র পরেছেন?

ঘ) কেন মনে হচ্ছে যে রাধা ধ্যান করছেন?

2.4.3 এলাইয়া বেণী . . . কালিয়া বঁধুর সনে।।

গদ্যরূপ :

বেণী ও ফুলের গাঁথনি এলিয়ে চুল খসিয়ে তিনি (রাধা) দেখছেন। হাসি-হাসি মুখে মেঘের পানে চেয়ে দু-হাত তুলে কী যেন বলছেন। তিনি একদৃষ্টিতে ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ করছেন। চণ্ডীদাস বলছেন, বন্ধু কালিয়ার সঙ্গে রাধার নব-পরিচয় ঘটেছে।

বক্তব্যসার :

চণ্ডীদাস রাধার সমস্ত আচরণের কারণ বুঝতে পেরেছেন। কালো মেঘ দেখতে দেখতে রাধার মনে পড়েছে নিজের কালো কেশের কথা। চুল এলো করে তিনি দেখছেন। মেঘ তো অনেক দূরে, তিনি একান্ত কাছে পেয়েছেন তাঁর কৃষ্ণকে। মুখে তাঁর হাসি ফুটেছে। দু-হাত তুলে মেঘকে তিনি বুঝি বিদায় জানাচ্ছেন।

তারপর রাধার দৃষ্টি নেমে এসেছে মাটিতে। সামনেই ময়ূর-ময়ূরী। ময়ূরের চিকন শ্যামল কণ্ঠে তিনি দেখছেন বন্ধু কৃষ্ণের রূপ। ময়ূর-ময়ূরীর দিকে চেয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেন যুগল জীবনের।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 2.2

(১) শূন্যস্থান পূরণ করুন:

ক) ..... বেণী ..... গাঁথনি
দেখয়ে ..... চুলি।

খ) কণ্ঠ করে .....।

গ) ..... কয় ..... পরিচয়।

(২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন:

ক) রাধা হাসিমুখে চেয়েছেন কোন্‌দিকে?
(ফুলের দিকে / বেণীর দিকে / মেঘের দিকে / ময়ূরের দিকে)

(৩) একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দিন:

ক) রাধা মেঘের দিকে দু-হাত তুলেছেন কেন?

খ) ময়ূর-ময়ূরীর দিকে চেয়ে রাধা কী দেখছেন?

গ) ভণিতা কাকে বলে?

ঘ) 'কালিয়া' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

ঙ) 'বঁধু' শব্দটির অর্থ কী?

2.5 আপনি যা শিখলেন

কবিতা বা পদটি পড়ে আপনি শিখলেন—

1. মধ্যযুগের কবিতার কিছু ভাষাগত বৈশিষ্ট্য;
2. রাধার বিশেষ আচরণের সঙ্গে মনের বিশেষ অবস্থার সংযোগ কীভাবে ঘটে চলেছে;
3. রাধার মনোভাব পরের পর যেভাবে বদলেছে তার মধ্যেকার যুক্তিশীলতা;
4. ভণিতা কাকে বলে।

2.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. রাধা-কৃষ্ণ-কাহিনিকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় এমন দুটি ধর্মীয় উৎসবের নাম লিখুন।
2. রাধার কী আচরণের জন্য তাঁকে যোগিনী বলে মনে হচ্ছে?
3. রাধা মেঘের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কেন?
4. রাধার আচরণে পর-পর যে-পরিবর্তন ঘটেছে তার বর্ণনা দিন।
5. মধ্যযুগের কবিতার লিখন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

শব্দার্থ ও টীকা

2.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

2.1

১) (ক) হৈল, ব্যথা।
(খ) আহারে, রাঙা, যোগিনী-পারা।
২) (ক) নির্জনে
৩) (ক) মেঘের দিকে
(খ) রাঙা।
(গ) যোগিনীদের।
(ঘ) রাধার দৃষ্টি স্থির, পরণে যোগিনীদের মতো পোশাক।

2.2

১) (ক) এলাইয়া, ফুলের, খসায়ে।
(খ) নিরীক্ষণে।
(গ) চণ্ডীদাস, নব।
২) মেঘের দিকে।
৩) (ক) মেঘকে তাঁর প্রয়োজন নেই।
(খ) ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ-বর্ণের মধ্যে দেখছেন কৃষ্ণের চিকন-শ্যামল রূপ।
(গ) কবিতার বা কাব্যাংশের শেষে কবিরা মন্তব্য করেন। নিজের নাম জানিয়ে দেন। এই অংশটি ভণিতা।
(ঘ) কৃষ্ণকে।
(ঙ) বন্ধু।

2.8 কবি পরিচিতি

চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বীরভূমের নান্নুর। ঠিক কোন সময়ে তিনি বর্তমান ছিলেন তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে, মনে হয় তিনি পঞ্চদশ শতকের কবি। চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)-এর প্রিয় ছিল চণ্ডীদাসের পদ। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম নিয়ে চণ্ডীদাস পদ রচনা করেছেন। রাধার পূর্বরাগের একটি পদ পাঠ্য বইয়ে আছে। পূর্বরাগ পর্বের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। সহজ সরল বাংলাভাষায় তিনি পদ রচনা করেছেন। এমন সব বাক্য তাঁর গানে ছড়িয়ে আছে যা আমাদের চমকিত করে। যেমন—

- শাশুড়ি ক্ষুরের ধার, ননদিনি জ্বালা
- চণ্ডীদাস বলে, বনের ভিতরে কভু কি রোদন সাজে
- সুজনে সুজনে মিলে কুজনে কুজনা

শব্দার্থ ও টীকা

2.9 সমধর্মী রচনা

চণ্ডীদাসের আর-একটি পূর্বরাগের পদ

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়।।
রাই এমন কেন বা হৈল।
গুরু দুরজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কী দেব পাইল।।
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে।।
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কী বা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা।
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকেছে কালিয়া-ফাঁদে।।

শব্দার্থ ও টীকা

3

পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল

সৈয়দ আলাওল

3.1 প্রস্তাবনা

বাংলা কাব্যে আলাওল ছিলেন খ্যাতিমান কবি। কবি আলাওলের রচিত বিখ্যাত কাব্য 'পদ্মাবতী' থেকে 'পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল' কবিতাটি সংকলিত। পদ্মাবতী কাব্যটি কোনও মৌলিক কাব্য নয়। এটি বিখ্যাত হিন্দি কবি মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য 'পদুমাবৎ' কাব্যের বঙ্গানুবাদ। কিন্তু অনুবাদ হলেও আলাওলের রচনাগুণে এটি মৌলিক কাব্যে পরিণত হয়েছে। ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটি রচিত হয়।

পদ্মাবতী সিংহলরাজ গান্ধর্বসেনের কন্যা। চিতোরের রাজা রত্নসেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। রাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে সখীদের কথোপকথনের মাধ্যমে বিবাহের পরিবেশটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সেই বিবাহ উৎসবের কাহিনিই 'পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল' কবিতাটির বিষয়বস্তু। একটি বিবাহের মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠানে কন্যার ব্যক্তিগত অনুভূতিকে কবি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

3.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনারা—

- হিন্দু সমাজের বাইরের একজন কবির লেখা হলেও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য একখানি আখ্যান কাব্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে পারবেন;
- স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কখনও দ্বৈতভাব থাকা উচিত নয়—একথা বুঝতে পারবেন;
- 'বিবাহমঙ্গল' শুধু বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গমাত্র নয়, বিবাহমঙ্গল স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর একাত্ম হবারও বার্তা—একথা বুঝতে পারবেন।

3.3 মূল পাঠ

(1)

বিচিত্র বসন পরি নানা আভরণ।
করেত লইল রামা নির্মল দর্পণ।।

নিজ আঁখি নিজ রূপ দেখি সুশোভন।
আপনার রূপ হেরি মজিল আপন।।

আপনা রূপের ভাবে আপে হইল লীন।
আপনা হেরিতে হইল আপ হোন্তে ভিন।।

সখিগণে এক মিলি নানা যন্ত্র বাহে।
কেহ কেহ সুস্বরে মঙ্গলগীত গাহে।।

সুসৌরভে নাসিকা শ্রবণ দিব্য স্বরে।
দিব্যরূপ হেরি আঁখি আনন্দ নির্ভরে।।

প্রেমমদে ঘূর্ণ আঁখি হইল তন্দ্রিত।
তনু অচেতন মাত্র মন সচকিত।।

সচেতন অচেতন স্বপ্ন সমসর।
দেখিছে শুনিছে যত হইল গোচর।।

তথাত দেখিল প্রিয় রত্নসেন মুখ।
হরিষে পুলক অঙ্গ মন সকৌতুক।।

রসময় আনন্দে-সাগরে ডুবি বালা।
নৃপ-গলে দিতে কন্যা মাগে বরমালা।।

শব্দার্থ ও টীকা

বিচিত্র বসন = নানা সুন্দর পোশাক।
আভরণ = সাজসজ্জা, অলংকার।
নির্মল দর্পণ = পরিষ্কার আয়না।
মজিল = মুগ্ধ হল।
আপে = নিজে।
লীন = বিভোর।
হোন্তে = থেকে।
মঙ্গলগীত = বিয়ের গান।
প্রেমমদে = গভীর প্রেমে।
তন্দ্রিত = তন্দ্রাজড়িত।
সচকিত = কম্পিত।
সমসর = সদৃশ, একই রকম।
গোচর = প্রত্যক্ষ।
হরিষে = আনন্দে।
তথাত = সেখানে।
মাগে = চায়।

(2)

সখীগণে বোলে বালা কীবা মতি তোর।
আপনার রূপ দেখি হইলা বিভোর।।

কোথা সেই নৃপরত্ন বিবাহের স্থলে।
অন্তঃপুরে থাকি চাহ মালা দিতে গলে।।

আপনা রূপ দেখি হইলা এমন।
প্রিয়তম রূপ হেরি করিবা কেমন।।

আন স্থানে মাগো বরমালা নিজ গলে।
এমত করিবা নাকি বিবাহের স্থলে।।

বিভাকালে হেন যদি করহ খানিক।
মুখ নিছি ফেলাইমু এ পঞ্চ মাণিক।।

এমত না কর যদি মোর দিব্য লাগে।
তোমাতে কহিলুঁ রানি বড়ো অনুরাগে।।

বোলে = বলে।
কীবা = কী?
মতি = ইচ্ছা।
আন = অন্য।
করিবা = করবে।
বিভা = বিবাহ।
মুখ নিছি = মুখ থেকে।
ফেলাইমু = ফেলব।
দিব্য = দিব্যি, শপথ।
তোমাতে = তোমাকে।
কহিলুঁ = বললাম।

(3)

উপহাসি সখী যদি এমত কহিল।
সম্ভ্রমিতা লজ্জাযুক্তা পদুত্তর দিল।।

যার হৃদে প্রেমাঙ্কুর পাগল সতত।
তুমি সবে নাহি জানো ভাব রস তত।।

ভাবের ভাবিনী যদি হইতা তুমি সবে।
এমত বচন মোকে না বুলিতা তবে।।

আমার মরমে ব্যথা তুমি উপহাসি।
এবে সত্য কহি কথা বচন প্রকাশি।।

তুমি বোলো প্রভু আছে বিবাহের স্থলে।
আমি দরশন পাই হৃদয় কমলে।।

যেই স্বামী সেই আমি নাহি ভাব ভিন।
আপনা চাহিতে প্রাণনাথ হইল লীন।।

যেই দিব্য দিলা সখী না হইত আন।
সমদৃষ্টি চাহি যদি না রহিব প্রাণ।।

ঘোঁঘট অন্তরে আঁখি মুখ হইল লুক।
সে সময় স্ত্রিয়া লাজে থাকি অধোমুখ।।

না জানি কী হয় মধু-চন্দ্রিমার কালে।
তোমার শপথ পাছে ততমাত্র ফলে।।

তাহার উপায় আছে শুনো সখীবর।
জাতি কুল লাজ মান লোকচর্চা ডর।।

শব্দার্থ ও টীকা

উপহাসি = উপহাস করে।
সম্ভ্রমিতা = সম্ভ্রমযুক্ত।
পদুত্তর = প্রত্যুত্তর।
প্রেমাঙ্কুর = প্রেমের উন্মেষ।
ভাবের ভাবিনী = একই ভাবের অংশীদার।
সমদৃষ্টি = সমান ভাবে দেখা।
বুলিতা = বলতে।
লুক = লুকালো।
স্ত্রিয়ালাজে = স্ত্রীসুলভ লজ্জায়।
মধুচন্দ্রিমা = বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর বিহার।
লোকচর্চা = লোকনিন্দা।
ডর = ভয়।

(4)

এতেক কহিতে শুভক্ষণ উপস্থিত।
মহাদেবী আজ্ঞা হইল চলিতে তুরিত।।

রত্নময় চতুর্দৌল নিকটে আনিল।
উঠ উঠ বলি সখী ধরিয়া তুলিল।।

জয় জয় শব্দ হইল মন উতরোল।
গীতে নাটে বাদ্যে হইল পুরী হুলস্থুল।।

চলিতে না চলে কন্যা অর্ধপদ গতি।
চাহিতে সখীর দিগে লজ্জা বাসে অতি।।

এতেক = এ পর্যন্ত।
তুরিত = শীঘ্র।
চতুর্দৌল = (চারজনে বয়ে নেবার) পালকি।
উতরোল = উতলা।
অর্ধপদ গতি = ধীর গতি।
লজ্জা বাসে অতি = খুব লজ্জার সঙ্গে।

শব্দার্থ ও টীকা

3.4 বিষয়ের রূপরেখা

[বিচিত্র বসন পরি ..... কন্যা মাগে বরমালা।]

3.4.1 গদ্যরূপ:

রামা বিচিত্র বসন ও নানা আভরণ পরে করেতে নির্মল দর্পণ নিলেন। নিজের আঁখিতে আপন সুশোভন রূপ দেখে আপনি মজলেন। আপনার রূপের ভাবনায় আপনি লীন হলেন। আপনাকে (নিজেকে) দেখতে দেখতে আপনি (নিজে) ভিন্ন হয়ে গেলেন। সখীগণ একসঙ্গে মিলে নানা যন্ত্র বাজায়। কেহ কেহ সুস্বরে মঙ্গলগীত গায়। নাসিকা সুসৌরভে শ্রবণ দিব্যস্বরে ও আঁখি দিব্যরূপে দেখেন। পদ্মাবতী (একান্তভাবে) আনন্দে নির্ভর করেন। প্রেমমদে (তাঁর) ঘূর্ণ (ঘূর্ণায়মান) আঁখি তন্দ্রিত হল। তনু অচেতন (হওয়া) মাত্রই তাঁর মন সচকিত। স্বপ্নে সচেতন (ও) অচেতন যেমন সমসর (একাকার) হয় (তেমনি) যা কিছু শুনছেন ও যা কিছু গোচরে (দৃষ্টিতে) আসছে সে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। তথায় তিনি রত্নসেনের মুখ দেখলেন এবং হরিষে (আনন্দে) তাঁর অঙ্গ ও মনে কৌতুক (জাগল)। রসময় আনন্দসাগারে ডুব দিয়ে বালা (কন্যা) নৃপের গলায় পরাতে বরমাল্য চাইলেন।

3.4.2 বক্তব্যসার:

চিতোরের রাজ অন্তঃপুরে রাজকন্যা পদ্মাবতীকে সখীরা সাজিয়ে দিচ্ছে বিচিত্র পোশাক ও নানা রত্নালংকারে। হাতে তার এক স্বচ্ছ দর্পণ। দর্পণে নিজের রূপ দেখে তিনি নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি তখন নিজের মধ্যে নিজে আর নেই। তিনি যে রাজকন্যা পদ্মাবতী সেই বোধটাই তাঁর মধ্য থেকে দূর হয়ে গেল।

সখীরা নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল। কেউ কেউ সুকণ্ঠে গাইছিল মঙ্গলগীত। চারধার সুন্দর গন্ধে আমোদিত।

যা কিছু দেখছেন, শুনছেন, সবকিছুর মধ্যে দেখতে পেলেন প্রিয় রত্নসেনের মুখ। তিনি রাজার গলায় মালা দেবার জন্য সখীর কাছে বরমালা চাইলেন।

পাঠগত প্রশ্ন 3.1

1. নীচের শব্দগুলির মধ্য থেকে সঠিক শব্দটি খুঁজে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান ঃ

বিচিত্র বসন পরি _____ আভরণ। (অনেক, নানা, মেলা)

করেত লইলা রামা _____ দর্পণ। (স্বচ্ছ, সুন্দর, নির্মল)

নিজ _____ নিজ রূপ দেখি সুশোভন। (মুখ, আঁখি, দেহ)

আপনার রূপ _____ মজিল আপন। (দর্শি, দেখি, হেরি)

2. 'নানা যন্ত্র বাহে'—কথাটির অর্থ কী? ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) নানারকম যন্ত্র বহন করে আনে।

(খ) নানারকম যন্ত্রকে বাহন করে।

শব্দার্থ ও টীকা

(গ) নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজায়।

3. 'কেহ কেহ সুস্বরে.....মঙ্গলগীত গাহে'—'মঙ্গলগীত' কী? কথাটির ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(অ) মঙ্গলগ্রহের গীতকে 'মঙ্গলগীত' বলা হয়।

(আ) পদ্মাবতীর এক সখীর নাম মঙ্গলা, তার সুমিষ্ট কণ্ঠের গীতকে মঙ্গলগীত বলা হয়েছে।

(ই) বিবাহানুষ্ঠানে দেবতার কাছে কল্যাণজনক যে প্রার্থনাগীত গাওয়া হয় তাকে 'মঙ্গলগীত' বলা হয়।

4. নীচের 'অ' সারিতে চারটি বাক্যাংশ আছে। ওই সারির বাক্যাংশের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন পাঁচটি বাক্যাংশ 'আ' সারিতে এলোমেলোভাবে আছে। প্রথম সারির বাক্যাংশের নম্বর পরের সারির বন্ধনীর মধ্যে দিয়ে চিনিয়ে দিন।

অ	আ	
(ক) প্রেমমদে ঘূর্ণ আঁখি	(i) হইল গোচর	( )
(খ) তনু অচেতন মাত্র	(ii) স্বপ্ন সমসর	( )
(গ) সচেতন অচেতন	(iii) মন সচকিত	( )
(ঘ) দেখিছে শুনিছে যত	(iv) হইল তন্দ্রিত	( )

5. 'হরিষে পুলক অঙ্গ'—কীসের হরিষ? ঠিক উত্তরটি টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন ঃ

(ক) পদ্মাবতী অপূর্ব রূপবতী বলে হরিষ।

(খ) পদ্মাবতীর বিবাহ অনুষ্ঠান বলে হরিষ।

(গ) সখীরা মঙ্গলগীত গাইছে বলে হরিষ।

(ঘ) দর্পণে রত্নসেনের মুখ দেখছে বলে হরিষ বা আনন্দ।

6. 'নৃপ গলে দিতে কন্যা মাগে বরমালা'—ঠিক উত্তরটি টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন ঃ

(ক) কন্যাটি কে?

অ. মহাদেবী আ. পদ্মাবতী ই. রাজকন্যার সখী

(খ) কার সঙ্গে তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠান হতে চলেছে?

অ. সিংহল রাজের সঙ্গে আ. চিতোর রাজের সঙ্গে

(গ) সে বরমালা চেয়েছে কার কাছে?

অ. রত্নসেনের কাছে আ. সখিদের কাছে ই. মহাদেবীর কাছে

7. কী দেখে পদ্মাবতীর অঙ্গ কেন পুলকিত হল?

_____

_____

শব্দার্থ ও টীকা

[সখীগণে বোলে বালা ..... বড়ো অনুরাগে]

3.4.3 গদ্যরূপ:

সখীগণ বলে তোর মতি কী। আপন রূপ দেখে বিভোর হলি। নৃপরত্ন কোথায় সেই বিবাহস্থলে! অন্তঃপুরে থেকে (তাঁর) গলায় মালা দিতে চাও! আপন রূপ দেখে তোর এমন হলে প্রিয়তমের রূপ দেখলে কেমন করবি। অন্যস্থানে (থেকে) নিজগলে বরমাল্য চাও। বিবাহ- স্থলেই এরকম করতে হয়। বিভাকালে (বিবাহের কালে) এরকম যদি কর মুখ থেকে পঞ্চমাণিক মুছে ফেলা হবে। আমাদের দিব্য লাগে তোমাকে রাণি বড় অনুরাগে (একথা) কইলাম।

3.4.4 বক্তব্যসার:

সখীরা তো অবাক! তারা বলল, রাজকন্যার এ কীরূপ মতি। নিজের রূপ দেখে সে এত বিভোর হয়ে গেল। রাজা রয়েছেন বিয়ের আসরে। আর কন্যা অন্তঃপুরে। রাজার গলায় তিনি মালা দিতে চাইছেন। নিজের রূপ দেখে তিনি কেন এমন অদ্ভুত আচরণ করবেন। আর যখন তিনি সামনাসামনি রাজাকে দেখবেন, তখন তিনি কী করবেন? তিনি নিজের গলায় দেবার জন্য বরমাল্য চাইছেন। বিবাহের সময় এমন করলে মুখ থেকে পঞ্চরত্ন মুছে ফেলা হবে।

পাঠগত প্রশ্ন : 3.2

1. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

(ক) পদ্মাবতী রাজার গলায় কখন বরমালা দিতে চেয়েছেন?

(অ) বিবাহের আসরে রাজা রত্নসেনকে দেখতে পেয়ে।

(আ) দর্পণে নিজের রূপের মধ্যে স্বামী রত্নসেনের মুখ দেখতে পেয়ে পদ্মাবতী তাঁর গলায় পরিয়ে দেবার জন্য বরমালা চেয়েছেন।

(ই) রত্নময় চতুর্দোলায় চড়ে বিবাহ সভায় যাত্রাকালে বরমালা চেয়েছেন।

(খ) সখীরা পদ্মাবতীকে উপহাস করলেন কেন?

(অ) রাজা দূরে বিবাহসভায় থাকা সত্ত্বেও অন্তঃপুরে বসে পদ্মাবতী বরমাল্য চেয়েছেন বলে।

(আ) নিজের রূপ দেখে পদ্মাবতী বিহ্বল হয়েছেন বলে।

(ই) স্বামীর প্রতি প্রেমের আবেশে পদ্মাবতীর চোখের তারা ঘুরতে লাগল বলে।

2. এমত না কর যদি মোর দিব্য লাগে।

(ক) কে কাকে বলেছে?

অ. পদ্মাবতী সখীদের বলেছেন।

আ. সখীরা পদ্মাবতীকে বলেছে।

(খ) দিব্য দেবার কারণ কী?

অ. বিবাহের সময় পদ্মাবতী যেন এরূপ অদ্ভুত আচরণ না করেন—তার জন্য তারা দিব্য দিচ্ছে।

আ. দর্পণে স্বামীর অলৌকিক দিব্যরূপ দেখে পদ্মাবতী আনন্দ- সাগরে ভাসছিলেন বলে তারা দিব্য দিচ্ছে।

3. নীচে চারটি বাক্য 'অ' এবং 'আ' সারিতে এলোমেলো করে লেখা আছে। বাক্যগুলি ঠিক করবার জন্য প্রথম সারির বাক্যের নম্বর পরের সারির বন্ধনীর মধ্য দিয়ে চিনিয়ে দিন।

অ	আ	
(ক) আপনার রূপ দেখি	(i) করিবা কেমন	( )
(খ) প্রিয়তম রূপ হেরি	(ii) বিবাহের স্থলে	( )
(গ) আন স্থানে মাগো বরমালা	(iii) হইলা এমন	( )
(ঘ) এমত করিবা নাকি	(iv) নিজ গলে	( )

4. (ক) অন্তঃপুরে থেকে পদ্মাবতী কেন বরমাল্য চাইলেন তা ৩টি বাক্যে উত্তর দিন।

(খ) প্রভু বিবাহস্থলে থাকলেও পদ্মাবতী অন্তঃপুরে থেকে কীভাবে তার দর্শন পান অনধিক ৩টি বাক্যে দিন।

[উপহাসি সখী ..... লোকচর্চা ডর]

3.4.5 গদ্যরূপ:

উপহাস করে সখীরা এরূপ বললে লজ্জাযুক্ত হয়ে সম্ভ্রমে (পদ্মাবতী) প্রত্যুত্তর করলেন। যার হৃদয় প্রেমের অঙ্কুরে সর্বদা পাগল তোমরা সকলে সেই ভাবরস ততটা জানোনা। তোমরা সবাই যদি (একই) ভাবের ভাবিনী হতে তবে এরূপ বচন আমাকে বলতে না। আমার মর্মের ব্যথা তোমরা উপহাস করছ তা এবার সত্যকথা প্রকাশ করছি। তোমরা বলো প্রভু বিবাহের স্থলে আছেন, আমি হৃদয় কমলে (তাঁর) দর্শন পাই। স্বামী যে আমিও সে, ভিন্ন ভাবনা নেই, আপনার (দিকে) চাইতে প্রাণনাথকে (সেখানে) লীন আছেন দেখি। সখীরা দিব্য দিলেও অন্য হত না। সমদৃষ্টি চান অন্যথায় প্রাণ রবে না। ঘোমটার অন্তরে চোখ মুখ লুকিয়ে রইল সে সময় স্ত্রী লজ্জায় অধোমুখ থাকে। মধুচন্দ্রিমার কালে কী হয় জানি না। তোমাদের শপথ সেই পর্যন্ত ফলবে (কার্যকরী থাকবে)। সখীরা শোনো তার উপায় হল জাতিকুল লজ্জামান লোকচর্চার ভয়।

3.4.6 বক্তব্যসার:

স্বামী-স্ত্রীর দেহ ভিন্ন হলেও প্রেমের ফলেই তা একাকার হয়ে যায়। সেখানে স্বামী দূরে থাকলেও তিনি স্ত্রীর হৃদয়ের মধ্যেই বিরাজ করেন সবসময়। স্ত্রীর মধ্যে স্বামী থাকেন আত্মলীন। সখীরা সবাই তাঁর মনের ভাব জানে না বলেই এমন কথা বলছে। তাঁর মনের প্রেমের ভাব সকলে যদি জানত, যদি তারা তাঁর ভাবের ভাবিনী হত, তবে এমন কথা তাঁকে বলতে পারত না। সখীরা দেখছে শুধু তাঁর বিবাহাচার। কিন্তু এই বিবাহাচারের অন্তরালে স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়ের যে সংযোগ ঘটে গেছে, তারা তার খবর রাখে না। বিবাহমঙ্গল কেবল বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানই নয়, বিবাহমঙ্গল স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর একান্ত হবারও বার্তা। এবার তিনি সখীদের কিছু সত্য কথা প্রকাশ করছেন। এ হল প্রেমের গূঢ় কথা। সখীরা বলছেন তাঁর প্রভু আছেন বিয়ের আসরে। কিন্তু পদ্মাবতী তো তাঁকে তাঁর হৃদয় কমলেই দেখতে পাচ্ছেন। যেখানে তাঁর স্বামী সেখানেই তিনি। তাঁদের মধ্যে কোনও ভিন্নতা নেই। পদ্মাবতী আরও বুঝিয়ে দিলেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। তিনি ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকে

শব্দার্থ ও টীকা

রাখেন, স্ত্রীসুলভ লজ্জায় তখন মুখ নীচু করে থাকেন। কিন্তু মধুচন্দ্রিমার মিলনের সময়ে কী ঘটবে তা তিনি জানেন না। সখীদের অনুমান তখন হয়তো ফলে যেতে পারে। তবে জাতি, কুল, লজ্জা, মান আর লোকনিন্দার ভয় তাঁকে হয়তো সংযত করতে পারে।

পাঠগত প্রশ্ন : 3.3

1. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

(ক) 'সম্ভ্রমিতা লজ্জাযুক্তা পদুত্তর দিলা'—'লজ্জাযুক্তা' এখানে কাকে বলা হয়েছে?

অ. পদ্মাবতীকে আ. সখীদের

(খ) 'তুমি সবে নাহি জানো ভাব রস তত'—ভাব রস কী?

(অ) ভাব রস হল আনন্দপূর্ণ কৌতুক রস।

(আ) ভাব রস হল প্রেমের গভীর ভাব।

(গ) 'এবে সত্য কহি'—সত্যটা কী?

(অ) রাজকন্যা পদ্মাবতীর হৃদয়ের মধ্যে তাঁর স্বামীর জন্য সর্বদা প্রেমের ধারা বয়ে যাচ্ছে।

(আ) পদ্মাবতীর স্বামী তাঁর হৃদয়কমলে সর্বদা বিরাজ করছেন।

(ঘ) পদ্মাবতীর সখীরা পদ্মাবতীর হৃদয়বার্তা বুঝতে পারেনি কেন?

(অ) সখীরা পদ্মাবতীর ভাবের ভাবিনী নয় বলে।

(আ) সখীরা নানা যন্ত্র বাজাতে এবং মঙ্গলগীত গাইতে ব্যস্ত ছিল বলে।

(ঙ) সখীদের সঙ্গে কথোপকথনে পদ্মাবতী সখীদের কী বুঝিয়েছেন?

(অ) তিনি সখীদের বুঝিয়েছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনও ভিন্নতা নেই। তারা এক ও অভিন্ন, এক দেহে লীন হয়ে থাকেন।

(আ) বিবাহের সময় সাজসজ্জা করে দর্পণে নিজের রূপ দেখে পদ্মাবতী আত্মহারা। তাঁর মনে জেগেছে এক ভাবান্তর। তাই তিনি সখীদের কাছে বরমালা চেয়েছেন স্বামী রত্নসেনের গলায় পরিয়ে দেবার জন্য।

(চ) পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল কবিতাটির মূল বিষয় কী?

(অ) পদ্মাবতীর বিয়ে ও তার রূপসজ্জা। এবং বিয়ে উপলক্ষেই সখীদের সুমিষ্ট কণ্ঠে মঙ্গলগীত পরিবেশন।

(আ) সুন্দর একটি রোমান্টিক প্রেমকাব্যের উপাখ্যান।

[এতেক কহিতে শুভক্ষণ ..... লজ্জা বাসে অতি]

3.4.7 গদ্যরূপ:

এসব বলতে বলতে শুভক্ষণ উপস্থিত (হল)। মহাদেবীর ত্বরিত চলতে আজ্ঞা হল। রত্নময় চতুর্দোল

নিকটে আনল। উঠ উঠ বলে তাঁকে সখীরা ধরে তুলল। জয় জয় শব্দে মন উতরোল হল। গীতে নাটে বাদ্যে পুরী হুলস্থুল হল। চলতে (গিয়েও) কন্যা চলেন না গতি তাঁর অর্ধপদ। সখীদের দিকে চাইতে অতি লজ্জা লাগে।

3.4.8 বক্তব্যসার:

সখীদের সঙ্গে পদ্মাবতীর কথাবার্তা যখন চলছিল, তখনই এল সেই শুভ মুহূর্ত। পদ্মাবতীকে তাড়াতাড়ি বিয়ে আসরে নিয়ে যাবার জন্য মহারানি আদেশ দিয়েছেন। রত্নময় চতুর্দোলা এসে পৌঁছল। সখীরা তাকে ধরে ধরে দাঁড় করাল। চারদিক জয় জয় শব্দে ভরে গেল। গীতে নাটকে বাদ্যে রাজপুরী পূর্ণ হল। লজ্জায় রাজকন্যার তখন চরণ সরে না। তিনি পুরোপুরি পা ফেলে হাঁটতে পারছেন না। সখীদের দিকে তাকাতেও তার লজ্জা।

পাঠগত প্রশ্ন : 3.4

1. (ক) 'এতেক কহিতে শুভক্ষণ উপস্থিত'—'এতেক কহিতে' বলতে কাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল?

(অ) সিংহল রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর সখীদের।

(আ) মহারানির সঙ্গে রাজকর্মচারীদের।

(খ) মহারানি কী আজ্ঞা দিয়েছিলেন?

(অ) পদ্মাবতীর সখীদের সুমিষ্ট কণ্ঠে মঙ্গলগীত গাইতে আদেশ দিয়েছিলেন।

(আ) মহারানি পদ্মাবতীকে তাড়াতাড়ি বিবাহস্থলে নিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন।

(গ) পদ্মাবতী কোন্ বাহনে বিবাহসভায় যাত্রা করলেন?

(অ) পদ্মাবতী সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে চেপে বিবাহসভায় যাত্রা করলেন।

(আ) পদ্মাবতী রত্নময় চতুর্দোলায় চড়ে বিবাহসভায় যাত্রা করলেন।

(ঘ) রাজপুরী হুলুস্থূল হল কেন?

(অ) গীতে নাটে বাদ্যে রাজপুরী হুলুস্থুল হল।

(আ) হস্তীর তাণ্ডবে রাজপুরী হুলুস্থুল হল।

(ঙ) বিবাহস্থলে যাবার পূর্বে পদ্মাবতীর মন উদ্‌বিগ্ন হল কেন?

(অ) সখীদের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারছেন না বলে।

(আ) জয়ধ্বনিতে স্থান ভরে ওঠায় পদ্মাবতীর মন উদ্‌বিগ্ন হল।

2. (ক) কন্যা 'চলিতে না চলে' কেন?

3.5 আপনি যা শিখলেন

1. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিন্তাভাবনার কোনও মূলগত পার্থক্য নেই।
2. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা হল প্রেমের মূল।
3. এই সমদৃষ্টি থাকলেই তাদের ব্যবধান যায় ঘুচে, তারা এক ও অভিন্ন হয়ে ওঠে।

শব্দার্থ ও টীকা

3.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. 'কেহ কেহ সুস্বরে মঙ্গলগীত গাহে'—কারা কোথায় মঙ্গলগীত গাইছিল? সেখানে মঙ্গলগীত গাওয়া হচ্ছিল কেন অনধিক পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন।

2. পদ্মাবতী কোথায় বসে কার গলায় কখন বরমালা দিতে চেয়েছেন, আর যাঁকে বরমালা দিতে চেয়েছেন তিনিই বা তখন কোথায় ছিলেন তা অনধিক আটটি বাক্যে উত্তর দিন।

3. 'আপনার রূপ দেখি হইলা এমন।
প্রিয়তম রূপ হেরি করিবা কেমন।।

কার প্রতি কাদের উক্তি? এই উক্তির তাৎপর্য কী?

4. 'যেই স্বামী সেই আমি।'— কথাটির তাৎপর্য কী?

5. 'সম্ভ্রমিতা লজ্জাযুক্তা পদুত্তর দিল।'—সম্ভ্রমিতা লজ্জাযুক্তা কাদের কী কথার প্রত্যুত্তর দিলেন? তিনি প্রত্যুত্তর কীভাবে দিলেন?

6. পদ্মাবতীর বিবাহসজ্জার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা ৮টি বাক্যে লিখুন।

7. 'পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল' কবিতায় রাজপুরীর অন্তঃপুরের যে পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে আট-দশটি বাক্যে তার পরিচয় দিন।

8. 'এতেক কহিতে শুভক্ষণ উপস্থিত'—'শুভক্ষণ উপস্থিত' হলে কী ঘটনা ঘটল?

9. 'বিবাহ সজ্জায় অন্তঃপুরে থেকে এক মধুরভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পদ্মাবতী এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন।'
(ক) মধুরভাবে আচ্ছন্ন বলতে কী বলা হয়েছে?
(খ) কী কাণ্ড করলেন?
(গ) কাণ্ডটি অদ্ভুত কেন?
(ঘ) তাহলে কি পদ্মাবতীর আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে বলে মনে করেন?

3.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

3.1

1. নানা, নির্মল, আঁখি, হেরি

2. ——— গ

3. ——— ই

4. ক — (iv)
খ — (iii)

গ — (ii)
ঘ — (i)

5. ——— ঘ

6. ক — আ
খ — আ
গ — আ

7. বিবাহের সাজে সজ্জিত পদ্মাবতী দর্পণে মুখ দেখতে গিয়ে স্বামীর মুখ দেখে পুলকিত।

3.2

1. ক — আ
খ — অ

2. ক — আ
খ — অ

3. ক — (iii)
খ — (i)
গ — (iv)
ঘ — (ii)

4. (ক) অন্তঃপুরে প্রেমবিহ্বল রাজকন্যা। বর বিবাহসভায়। প্রেমাবিষ্ট পদ্মাবতীর মানসিক বিভ্রমের জন্যই এই বরমাল্য চাওয়া।

(খ) প্রগাঢ় প্রেমানুভূতিতে রাজকন্যার মানসিক বিভ্রম। বাস্তব-অবাস্তব বোধ তাঁর লুপ্ত। তাঁর হৃদয়ে ভাবী স্বামীর উপস্থিতির অনুভব।

3.3

1. ক — অ
খ — আ
গ — আ
ঘ — অ
ঙ — অ
চ — আ

2. সখীরা উপহাস করেছিল বলে।

3.4

1. ক — অ
খ — আ
গ — আ
ঘ — অ
ঙ — আ

শব্দার্থ ও টীকা

2. সখীদের উপস্থিতিতে নারীসুলভ লজ্জায় তাঁর গতি মন্থর।

লেখক পরিচিতি

কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে কবি জন্মগ্রহণ করেন চট্টগ্রামে। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর নানা ভাষার প্রতি আগ্রহ লক্ষ করা যায়। সংগীত- শাস্ত্রেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। আরবি, ফারসি ও হিন্দি ভাষায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। সংস্কৃত শাস্ত্রেও তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ।

হিন্দু সমাজের বাইরের একজন মানুষ হয়েও হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সে শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তিনি।

আরাকান রাজ্যের (বর্তমান মায়ানমারের অন্তর্গত) প্রধানমন্ত্রী মগন ঠাকুর ছিলেন তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বাংলাভাষায় কাব্য রচনা করতে তিনি আলাওলকে উৎসাহ দিয়েছেন। আরাকান রাজ্যের সেনাবাহিনীতে তিনি কাজ করতেন। আলাওলের জীবনাবসান হয় ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে।

সমধর্মী রচনা

কবি দৌলত কাজি রচিত ঃ '**সতী ময়না**'।

শব্দার্থ ও টীকা

4

কাশীরাম দাশ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

4.1 প্রস্তাবনা

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন বিদেশে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছেন। তখন তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে। অনেক পড়াশোনা, অনেক কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায় তাঁর গ্রাম সাগরদাঁড়ির কথা, ছোটোবেলায় চেনা কপোতাক্ষ নদের কথা। আর সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কবিদের কথা, পাশ্চাত্যদেশের লেখকদের কথা, দেশের নানা মনীষীদের কথা। সেই সময়ে তিনি ইটালীয় কবি পেত্রার্কের এক নতুন শৈলীতে লেখা কবিতায় আকৃষ্ট হন। তার নাম 'সনেট'। মধুকবি সেই চোদ্দটি পঙ্‌ক্তির কবিতার অনুসরণে তাঁর মনে পড়া বিষয়গুলিকে নিয়ে কবিতা লিখলেন। নাম দিলেন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি'।

'কাশীরাম দাস' নামের কবিতাটি ওই জাতীয় কবিতা। কাশীরাম দাস সংস্কৃত মহাকাব্যকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাঙালি পাঠককে মহাভারতের রসসুধা পান করিয়েছেন। বাঙালিমাত্রেই এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। মধুকবি বাঙালি জাতির প্রতিনিধি হিসেবে এই ছোট্ট কবিতার মধ্য দিয়ে কবি কাশীরামের মহান কীর্তিকে স্মরণ করেছেন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে।

এই কবিতার ভাষায় একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, তা হল বাংলা ভাষার প্রাচীন শব্দের সঙ্গে আধুনিক শব্দের মিশ্রণ। যেমন, রাখিলা, তেমতি, পূজি, মুকতি, খননি, নারিবে — এগুলি প্রাচীন পদ, শুধু কবিতায় ব্যবহৃত হয়। এই সব বিশেষ রূপের সঙ্গে 'আকুল', 'রোদন', 'গৌড়'-এর মতো আধুনিক শব্দ পাশাপাশি বসেছে। কাশীরাম দাস বাংলা সাহিত্যের একজন প্রাচীন কবি, তাঁর স্মরণে রচিত এই কবিতায়, প্রাচীনতার গৌরব ফুটিয়ে তোলার জন্য ভাষার এমন মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

4.2উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি —

- কবি মধুসূদনের মহাকবি কাশীরাম দাসের শ্রেষ্ঠ কীর্তিকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে পারবেন;
- মহাভারত মহাকাব্যের মহনীয়তার কথা স্মরণ করতে পারবেন;
- বাংলা ভাষার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ বোধ করবেন;
- সাধারণ বাঙালির মহাভারত মহাকাব্যের মূল রসগ্রহণের কথা জানতে পারবেন;
- 'সনেট' বা চতুর্দশপদী কবিতার গঠন-কাঠামোর বিষয় জানতে পারবেন;
- এই কবিতায় উল্লেখিত পৌরাণিক বিভিন্ন চরিত্রের কথা জানতে পারবেন।

4.3 মূল পাঠ

কাশীরাম দাস

(1)

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি;
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন!)
সগর বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন;

(2)

সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে!
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্॥

সনেট (Sonnet) = বিশেষ রীতিতে লেখা চোদ্দ লাইনের গীতিকবিতা।
চন্দ্রচূড় = চূড়ায় যার চন্দ্র।
জটাজাল = জটারাশি।
যেমতি = যেমনভাবে।
সংস্কৃত-হ্রদ = সংস্কৃত ভাষা-রূপ আবদ্ধ জলাশয়।
জাহ্নবী = গঙ্গা নদীর অন্য নাম।
ভারত-রস = মহাভারত মহাকাব্যের স্বাদ।
নর-কুল-ধন = মানুষের সমাজের সম্পদ।
সাধিলা = সাধন বা সম্পন্ন করলেন।
ভগীরথ = সগর বংশের সন্তান, রাজা।
সগর বংশ = সগর নামে এক পৌরাণিক রাজার কুল।

ভারত-রস = মহাভারত মহাকাব্যের স্বাদ।
ভাষা-পথ = ভাষারূপ পথ।
খননি = খনন করে, খুঁড়ে।
স্ববলে = নিজের শক্তিতে।
কবীশ = কবিশ্রেষ্ঠ।
কাশি = কাশীরাম দাস।

4.4 বিষয়ের রূপরেখা

চন্দ্রচূড় . . . তিন ভুবন

4.4.1 গদ্যরূপ :

পবিত্র গঙ্গা (জাহ্নবী) যেমন মহাদেবের জটামণ্ডলে আবদ্ধ ছিলেন, ঋষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ঠিক তেমনি মহাভারত মহাকাব্যের রূপ রসকে সংস্কৃত-ভাষারূপ হ্রদে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। ফলে সেই রসসুধা পানে আকুল বাঙালি তৃষ্ণায় রোদন করছিল। সগর বংশের সন্তান রাজা ভগীরথ যিনি পৃথিবীর বুকে তপস্যা করে ধন্য এবং মানবসমাজে সম্পদবিশেষ, তিনি কঠোর তপস্যায় গঙ্গাকে মর্তে এনে সগরবংশের শাপভ্রষ্ট সন্তানদের মুক্ত করলেন। গঙ্গাকে প্রবাহিত করে তিন ভুবনকে (স্বর্গ-মর্ত-পাতাল) পবিত্র করলেন।

4.4.2 বক্তব্যসার :

মহাকবি বেদব্যাস সংস্কৃত ভাষায় 'মহাভারত' মহাকাব্য রচনা করেন। মূল কাহিনি যদিও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, সেই কাব্যের বিভিন্ন ঘটনা এবং বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সমস্ত যুগের কথাই যেন ধরা পড়েছে। ভাবতে অবাক লাগে এই কাব্যে এমন ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা আজকের জীবনেও সত্য। এই কাব্যে একদিকে যেমন সত্য, ধর্ম, প্রেম, ভালোবাসা, শান্তি, মনুষ্যত্বের কথা আছে, অন্যদিকে ঈর্ষা, হিংসা, লোভ, মোহ, ধ্বংস ও যুদ্ধের কথা আছে। এই কাব্যের ভাষা এবং ছন্দ রসসমৃদ্ধ। পাঠকমাত্রেই এর স্বাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হন। কিন্তু দুঃখের কথা, সংস্কৃত না-জানা বাঙালি এ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের কথা শুনলেও নিজে পড়ে এর স্বাদগ্রহণ করতে পারেননি। এক্ষেত্রে কবি কাশীরাম দাস এক মহৎ কাজ করেছেন। একে বাংলায় অনুবাদ করেছেন সুললিত পয়ার ছন্দে (চরণগুলির শেষে মিল এবং চোদ্দো অক্ষরের কবিতা)।

কবি মধুসূদন সুন্দর উপমার সাহায্যে কাশীরামের কীর্তিগাথা বর্ণনা করেছেন। তিনি পুরাণের আখ্যান অবলম্বন করে বলেছেন যে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র কপিলমুনির অভিশাপে ভস্মীভূত হলে, অনেক বছর বাদে সেই বংশের সন্তান রাজা ভগীরথ গভীর তপস্যায় গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করে মর্তে এনে সেই সন্তানদের মুক্তি দিলেন। কিন্তু স্বর্গ থেকে গঙ্গার মর্তে নামার সময় সেই প্রবল স্রোতকে ধারণ করা কঠিন ছিল। মহাদেবের জটাজালে তিনি আবদ্ধা ছিলেন। ভগীরথ কঠিন তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে গঙ্গাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন।

কবি মধুসূদন কাশীরাম দাসকে ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেননা মহাভারত মহাকাব্যরূপ গঙ্গা যেন সংস্কৃত ভাষারূপ মহাদেবের জটাজালের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। আর কাশীরাম কঠোর পরিশ্রম করে সেটি পাঠকের কাছে গ্রহণীয় ও সুখপাঠ্য করে তোলেন। তিনি সুললিত ছন্দে বাংলা মহাভারত রচনা করেছেন। তিনি শুধু একারণে বাঙালি পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ভারতবর্ষের পবিত্রতম নদী গঙ্গাকে মর্তে এনে মর্ত্যলোককে ভগীরথ পবিত্র করেছেন, ঠিক তেমনি কাশীরামও মহাভারতরূপ পবিত্র মহাকাব্যের স্বাদ গ্রহণ করিয়ে সকলকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তিনি ধন্য।

পাঠগত প্রশ্ন 4.1

১। বন্ধনীর মধ্য থেকে কবিতায় ব্যবহৃত ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে ফাঁকা জায়গায় বসান ঃ

ক) চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি ————। (গঙ্গা/জাহ্নবী)

শব্দার্থ ও টীকা

খ) . . ঢালি ———— রাখিলা যেমতি। (বাংলা-হ্রদে/ সংস্কৃত-হ্রদে)

গ) কঠোরে গঙ্গায় পূজি ———— ব্রতী, (ভগীরথ/সগর)

ঘ) পবিত্রিলা আনি ————, এ তিন ভুবন। (মায়ে/ মাকে)

২। **একটি বাক্যে উত্তর লিখুন :**

ক) 'ভারত-রস' বলতে কী বোঝায়?

খ) সগর-বংশের অভিশপ্ত সন্তানদের মুক্তিসাধন করলেন কে?

গ) কীসের তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ রোদন করত?

ঘ) 'কাশীরাম দাস' কবিতার কবির নাম কী?

ঙ) সংস্কৃত-হ্রদের সঙ্গে কীসের তুলনা করা হয়েছে?

৩। **প্রতিশব্দ দিন :**

ক) জাহ্নবী

খ) চন্দ্রচূড়

৪। **বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিকের বিষয়ের মধ্যে ঠিক সম্পর্কটির সংখ্যা শূন্যস্থানে লিখুন :**

A	উত্তরের সংখ্যা	**B**
i) সংস্কৃত-হ্রদ		(a) কাশীরাম দাস
ii) ভগীরথ -		(b) জাহ্নবী
iii) মহাভারত মহাকাব্য -		(c) মহাদেবের জটা

সেই রূপে . . . পূণ্যবান

4.4.3 গদ্যরূপ :

সেইভাবে নিজের শক্তির সাহায্যে ভাষার পথকে (সংস্কৃত ভাষা) খনন করে (খুঁড়ে) ভারত-রসের (মহাভারত মহাকাব্যের স্বাদ) স্রোত তুমি বইয়ে দিয়েছ এবং তা করেছ তার নির্মল বা পবিত্র জলে গৌড়ের (বঙ্গবাসীর) তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে। গৌড়দেশ (বঙ্গদেশ/বাঙালি জাতি) সে ঋণ কখনও শোধ করতে পারবে না। মহাভারতের কথা (কাহিনি) অমৃত বা সুধার মতো। ওগো কাশীরাম, তুমি শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে পুণ্যবান্ বা মহত্ত্বের অধিকারী।

4.4.4 বক্তব্যসার :

কবি কাশীরাম দাসের কাছে বাঙালির ঋণের শেষ নেই। মহাকবি বেদব্যাসের মহাভারতকে সংস্কৃতভাষা-না-জানা বাঙালি পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। তা করেছেন বাংলায় ভাবানুবাদের মধ্য দিয়ে। একথা ভাবতে গেলে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু হয়ে আসে।

এ কাজকে কবি মধুসূদন ভগীরথের গঙ্গাকে মর্তে নিয়ে আসার মতোই কঠিন বলে মনে করেছেন। স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্তে নিয়ে আসার জন্য দীর্ঘ যাত্রাপথকে খুঁড়ে রাস্তা তৈরি করেছিলেন ভগীরথ। ঠিক তেমনি কাশীরাম সংস্কৃত রূপ কঠিন ভাষায় লেখা কাহিনিকে যেন খনন করে, অর্থাৎ বিশ্লেষণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার সহজ রাস্তা তৈরি করেছেন। সেইপথে গঙ্গারূপ মহাভারতের রসধারাকে প্রবাহিত করেছেন।

এর ফলে মহাভারতের স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত তৃষ্ণার্ত বাঙালি সুললিত ছন্দে লেখা বাংলা মহাভারতের নির্মল জল পানে তৃষ্ণা নিবারণ করতে পেরেছিলেন। এজন্য কাশীরাম দাসের ঋণ বাঙালি কখনওই শোধ করতে পারবে না। এই অসাধারণ কীর্তির জন্য শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম কাশীরাম দাস ধন্য।

পাঠগত প্রশ্ন 4.2

১। **শূন্যস্থানে ঠিক শব্দটি বসান :**

ক) সংস্কৃতে লেখা মহাভারত মহাকাব্যের রচয়িতা ছিলেন ————। (কৃত্তিবাস/ কাশীরাম দাস/ ঋষি দ্বৈপায়ন)

খ) গৌড়ভূমি কার ধার শোধ করতে পারবেন না? ———— (ঋষি দ্বৈপায়নের/ মধুসূদনের/ কাশীরাম দাসের)

গ) জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে ———— জলে! (নির্মল/ মিষ্টি/ বিমল)

ঘ) 'হে কাশি!' — এখানে 'কাশি' হলেন ————। (কাশীধাম/ বেনারস/ কাশিবাবু/ কাশীরাম দাস)

২। **'ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি' — 'ভারত-রস' বলতে কবি যা বুঝিয়েছেন তা বোঝাতে নীচের ঠিক খোপটিতে (✓) চিহ্ন দিন।**

ক) ভারতের রস — ☐

খ) মহাভারত মহাকাব্যের স্বাদ — ☐

গ) ভারতবর্ষের কাহিনি — ☐

ঘ) গঙ্গানদীর প্রবাহ — ☐

৩। **'গৌড়ভূমি' বলতে বোঝায় — (ঠিক উত্তরে ✓ চিহ্ন দিন) :**

ক) পশ্চিমবঙ্গ

খ) বঙ্গভূমি

গ) বাঙালি জাতি

ঘ) পূর্ববঙ্গ (আজকের বাংলাদেশ নামে রাষ্ট্র)

৩। **নীচের শব্দগুলির প্রাচীন রূপের জায়গায় আধুনিক রূপ লিখুন :**

ক) যেমতি _____

খ) তেমতি _____

গ) পূজি _____

ঘ) পবিত্রিলা _____

ঙ) খননি _____

চ) নারিবে _____

শব্দার্থ ও টীকা

4.5 আপনি যা শিখলেন

1. বাংলা মহাভারতের রচয়িতা (অনুবাদক) কাশীরাম দাসের নাম এবং মহান কীর্তির কথা।
2. সগর বংশের রাজা ভগীরথের স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্তে প্রবাহিত করার পৌরাণিক কাহিনি।
3. মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাংলা কবিতার নতুন রীতি অর্থাৎ চতুর্দশপদী কবিতা লেখার বিষয়।
4. কবি মধুসূদনের মহাকবি কাশীরাম দাসের প্রতি বাঙালির প্রতিনিধি হিসেবে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাবার কথা।
5. বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত কতকগুলি বিশেষ শব্দ, যা গদ্যে ব্যবহৃত হয় না।

4.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. 'কাশীরাম দাস' কবিতাটি গঠনের দিক দিয়ে কী জাতীয় কবিতা?
2. কবিতাটির নাম 'কাশীরাম দাস' রাখা হয়েছে কেন? (চার/পাঁচটি বাক্যে উত্তর লিখুন)
3. কাশীরাম দাসকে ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন? (৪/৫টি বাক্যে লিখুন)
4. দ্বৈপায়ন কে? তিনি বিখ্যাত কেন? তিনি কী নামে বিখ্যাত ছিলেন?
5. কীসের তৃষ্ণায় বঙ্গবাসী আকুলভাবে রোদন করেছেন? কে সেই তৃষ্ণা মেটাবার চেষ্টা করেছেন? কীভাবে তিনি সে তৃষ্ণা মিটিয়েছেন ২/৩টি বাক্যে লিখুন।
6. মহাভারতের কথা অমৃত-সমান বলে কেন মনে করেছেন মধুকবি? কাশীরাম দাসকে কবিদের মধ্যে পুণ্যবান বলেছেন কেন ২/৩টি বাক্যে লিখুন।
7. কবিতাটির অন্য কী শিরোনাম দেওয়া যায়?
8. সংস্কৃত হ্রদকে মহাদেবের জটার সঙ্গে এবং জাহ্নবীর সঙ্গে মহাভারত মহাকাব্যের তুলনা কি যুক্তিযুক্ত হয়েছে? সংক্ষেপে লিখুন।

4.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

4.1

১. ক) জাহ্নবী,
খ) সংস্কৃত-হ্রদে,
গ) ভগীরথ,
ঘ) মায়ে।

২. ক) মহাভারত মহাকাব্যের রসসুধা বা সেই কাব্যের অপূর্ব কাহিনির স্বাদ।
খ) সগর-বংশের ভস্মীভূত সন্তানদের মুক্তি সাধন করলেন সেই বংশের সন্তান ভগীরথ।

গ) মহাভারতের রসসুধা পানে বঞ্চিত বাংলাদেশ তৃষ্ণায় আকুল হয়ে রোদন করত।

ঘ) কবির নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ঙ) সংস্কৃত-হ্রদের সঙ্গে মহাদেবের জটামণ্ডলের তুলনা করা হয়েছে।

৩. ক) গঙ্গা

খ) মহাদেব বা শিব

৪. i) (c)

ii) (a)

iii) (b)

4.2

১. ক) ঋষি দ্বৈপায়ন,

খ) কাশীরাম দাস,

গ) বিমল,

ঘ) কাশীরাম দাস।

২. খ)

৩. খ)

৪. ক) যেমন

খ) তেমন

গ) পূজা করে

ঘ) পবিত্র করলেন

ঙ) খনন করে, খুঁড়ে

চ) পারবে না

কবি পরিচিতি

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। জন্ম ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪। জন্মস্থান — বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রাম, কপোতাক্ষ নদের ধারে। পিতা - রাজনারায়ণ, মাতা - জাহ্নবী দেবী। শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ। পরে কলকাতায় এসে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। তিনি ছিলেন এই কলেজের 'উজ্জ্বলতম ছাত্র'। ছাত্রজীবনেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। তিনি একদিকে যেমন ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে অনুরাগী হয়ে ওঠেন, তেমনি পাশ্চাত্য আচার- আচরণেও প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেন। এর ফলে হিন্দুধর্ম ছেড়ে খ্রিস্ট ধর্মগ্রহণ করেন এবং ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত যান। ১৮৪৮-এ চলে যান মাদ্রাজে এবং সেখানে সাত বছর ছিলেন। সেখানে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা করেন। প্রথমা স্ত্রীকে ত্যাগ করে এমিলি হেনরিয়েটা নামে এক ফরাসি মহিলাকে বিয়ে করেন। কলকাতাতেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করেন। ১৮৬২ সালে বিলেতে যাবার আগেই তিনি লেখেন 'শর্মিষ্ঠা', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী'

শব্দার্থ ও টীকা

প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন। কাব্যগ্রন্থ হিসেবে তাঁর যেসব বই ওই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয় সেগুলি হল — 'তিলোত্তমা সম্ভবকাব্য', 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'রামায়ণ মহাকাব্য' অবলম্বনে রচিত। এই মহাকাব্য বাংলা সাহিত্যের এক বৈপ্লবিক রচনা। ফরাসি দেশে থাকাকালে ইটালীয় কবি প্রেত্রার্কের 'সনেট'-এর অনুসরণে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে অভিনব কবিতাগুচ্ছ রচনা করেন — 'কপোতাক্ষ নদ', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', 'কৃত্তিবাস', 'কাশীরাম দাস' ইত্যাদি।

মাইকেল মধুসূদন ২৯ জুন ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে প্রয়াত হন।

4.8 সমধর্মী কবিতা

'কাশীরাম দাস' কবিতার মধ্য দিয়ে কবি মধুসূদন একদিকে যেমন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মহাভারত'-এর মহনীয়তাকে স্মরণ করেছেন, অন্যদিকে তেমনই সংস্কৃত ভাষার বেড়াজাল থেকে একে মুক্ত করে বাঙালি পাঠককে এর রসসুধা পান করাবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

অনুরূপভাবে মধুসূদন চতুর্দশপদী কবিতার ছাঁদে বাংলা রামায়ণ-এর রচয়িতা কৃত্তিবাসকেও স্মরণ করেছেন নীচের কবিতাটিকে।

কৃত্তিবাস

জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা! - কীর্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথাস্বর, কবিপতি,
নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে! আপনি ভারতী,
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পুর্ব-জনমের তব স্মরি হে ভকতি।
পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত লহরি;
তেমতি, যশস্বি, তুমি সবঙ্গ মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি।

শব্দার্থ ও টীকা

5

প্রশ্ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

5.1 প্রস্তাবনা

অনেকের বিশ্বাস এই পৃথিবী ভগবানের সৃষ্টি। সুতরাং এই পৃথিবী ও তার জীবজগতের কল্যাণ কামনাই তিনি করবেন—এটাই স্বাভাবিক। এখানকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ নানা অসাধু পথে গ্রাস করে শক্তিমান হচ্ছে। আর বাকিরা হতদরিদ্র বঞ্চিত জীবনযাপন করছে। পৃথিবীর পরিবেশ আজ হিংসা ও বিদ্বেষে দূষিত ; মানবসমাজও নানা সংকীর্ণ ভাগে বিভক্ত। শান্ত পৃথিবী আজ অশান্ত ও বিপন্ন। এই অবস্থা কখনই স্রষ্টার কাম্য নয়। তাই এই কবিতায় কবি ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন। আর এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই মানবসমাজের আসল চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং একই সঙ্গে প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া গিয়েছে। পরের মুখের গ্রাস যারা কাড়ে তারাই শুভশক্তির বিরোধী, তারাই সর্বনাশা শক্তি। ভগবান এই সর্বনাশা শক্তির প্রতি বিমুখ ও বিরূপ। যারা তাঁর সৃষ্টিকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাদের প্রতি তিনি স্বাভাবিকভাবেই রুষ্ট। প্রশ্নের মাধ্যমেই কবি অপরাধীদের ও তাদের অপকর্মকে চিনিয়ে দিয়েছেন এবং তারা যে ভগবানের অর্থাৎ পৃথিবীর মঙ্গলকামী শক্তির কোনো প্রশ্রয় পাবে না তা দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। কবি এইভাবে মানুষের শুভশক্তি ও অশুভশক্তিকে চিনিয়ে দিয়ে এক হিংসা-দ্বেষমুক্ত সুস্থ সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

অসাধু = অসৎ।
গ্রাস = দখল।
দ্বেষ = শত্রুতা।

5.2 উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে আপনি—

- বর্তমান সমাজকে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।
- এই পৃথিবীতে কারা এবং কেন মনীষীদের উপদেশ অমান্য করছে তা ধরতে পারবেন।
- দুর্বলেরা যে সবলদের লোভ ও হিংসার জন্য ন্যায় বিচার পাচ্ছেন না তা উপলব্ধি করতে পারবেন।
- দুর্বলের প্রতি এক মানবিক মমত্ববোধে উদ্দীপ্ত হবেন।
- মানবসমাজে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত পথের হদিস পাবেন।

উদ্দীপ্ত = উত্তেজিত।
হদিস = খোঁজ, সন্ধান।

5.3 মূল পাঠ

(1)

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥

শব্দার্থ ও টীকা

দূত = প্রতিনিধি যা যে সংযোগ রক্ষা করে।
দয়াহীন সংসারে = নিষ্ঠুর সংসারে।
শক্তের = শক্তিশালীর।
বরণীয় = বরণযোগ্য।
স্মরণীয় = স্মরণযোগ্য।
ব্যর্থ = বিফল।
ব্যর্থ নমস্কারে = মনীষীদের মানুষকে ভালোবাসা ও অন্তর থেকে হিংসা দূর করার উপদেশ ধনীরা প্রত্যাখ্যান করছে।

(2)

আমি যে দেখেছি, গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু, তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥

নিঃসহায়ে = অসহায়কে।
প্রতিকার = প্রতিবিধান।
শক্ত = শক্তিমান।
তরুণ বালক = কিশোর। কবি এখানে এক তরুণ বালকের যন্ত্রণাকাতর ছবি তুলে ধরেছেন।

(3)

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে ;
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষম করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

রুদ্ধ = বাধাপ্রাপ্ত।
কারা = কারাগার।
অমাবস্যা = কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি, এখানে অন্ধকার।
দুঃস্বপ্ন = অশুভ ঘটনার স্বপ্ন।
লুপ্ত = আচ্ছন্ন।
লুপ্ত.....তলে = কবির চিন্তাকে দুশ্চিন্তায় ভরিয়ে তোলে।
বিষাইছে = বিষাক্ত করছে।

শব্দার্থ ও টীকা

5.4 বিষয়ের রূপরেখা

[ভগবান, ... ব্যর্থ নমস্কারে]

5.4.1 গদ্যরূপ :

ভগবান যুগে যুগে বারে বারে তুমি দয়াহীন সংসারে দূত পাঠিয়েছ। তাঁরা সবাইকে ক্ষমা করতে ও অন্তর থেকে সমস্ত বিদ্বেষ দূর করতে বলেন। তাঁরা বরণীয় ও স্মরণীয়, তবুও বাহির-দ্বারে আজ দুর্দিনে তাঁদের ব্যর্থ নমস্কারে ফিরানো হল।

5.4.2 বক্তব্যসার :

কবি রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীর স্রষ্টার ভূমিকায় এক অদৃশ্য শুভ শক্তির কল্পনা করেছেন। স্রষ্টার কাছে সব মানুষই সমান হবে এটাই প্রত্যাশিত। অথচ সেই শুভশক্তিকে অমান্য করে সবল মানুষেরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করছে ; তাদের প্রাপ্য অধিকার ও সম্পদ কেড়ে নিচ্ছে। যুগে যুগে অনেক মনীষী এই পৃথিবীতে এসে মানুষদের হিংসা ও বিদ্বেষ ভুলে ক্ষমা ও ভালোবাসার শুভপথে চলতে বলেছেন। কবি এই মনীষীদেরই ভগবানের প্রেরিত প্রতিনিধি বা দূত বলেছেন। কিন্তু তাঁদের সেই শিক্ষা স্বার্থপর লোভীরা গ্রহণ করেনি। শুধু লোক-দেখানো সম্মানটুকু জানিয়ে তাদের বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। একদল মানুষের এই হৃদয়হীন আচরণ কবিকে ব্যথিত করেছে ; কবির চোখে এই সংসার দয়াহীন বলে মনে হয়েছে।

পাঠগত প্রশ্ন 5.1

১. **ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ**

(ক) বরণীয় কারা ?

(অ) ভগবান (আ) কবি (ই) ভগবানের দূতেরা।

(খ) তারা কাদের ক্ষমা করতে ও ভালোবাসতে বলেছেন ?

(অ) সবলদের (আ) দুর্বলদের (ই) সব মানুষকে।

২. (ক) কারা কেমনভাবে বরণীয় ও স্মরণীয়দের নির্দেশে সাড়া দিয়েছিল ?

(খ) সংসারকে দয়াহীন বলা হয়েছে কেন ?

[আমি যে ..... মাথা কুটে]

5.4.3 গদ্যরূপ :

কপট রাত্রি ছায়ায় গোপন হিংসা নিঃসহায়কে আঘাত করতে দেখেছি। আমি দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আমি দেখেছি তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছোটে এবং কী যন্ত্রণায় পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে মরেছে।

5.4.4 বক্তব্যসার :

সমাজে অত্যাচার, বঞ্চনা, কপটতা ইত্যাদি অসামাজিক কাজকে অন্ধকার জগতের কাজ বলেই মনে

শব্দার্থ ও টীকা

অসহনীয় = অসহ্য।

করা হয়। দুর্বলদের ওপর সবলেরা প্রতিনিয়ত এই অন্ধকার জগতের জঘন্য অপরাধমূলক আক্রমণ করে চলেছে। তারা বিচারব্যবস্থাকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করে নিজেদের পক্ষে এনে শাস্তি এড়িয়ে যাচ্ছে। শক্তিমানদের দাপটে দুর্বলেরা কোনোদিনই সুবিচার পাচ্ছে না এবং অন্যায়ের প্রতিকার না পেয়ে এক অসহনীয় জীবন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কবি এক স্বপ্নভঙ্গ উন্মাদ তরুণের পাথরে মাথা কোটার ছবি এঁকে সমাজের অসহায় মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন।

5.4.5 মন্তব্য :

'গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে'— শক্তিমান ইংরেজ প্রভুদের নির্দেশে ১৯৩১ সালে হিজলি জেলে প্রহরীরা যে নিরীহ বন্দিদের ওপর রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে ২ জনকে খুন ও ২০ জনকে আহত করে, পংক্তিটি তার কথাই স্মরণ করায়।

পাঠগত প্রশ্ন 5.2

১. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

(ক) 'কপট রাত্রি ছায়ে'—কাকে আঘাত করা হয়েছে?

(অ) তরুণ বালককে (আ) কবিকে (ই) নিঃসহায়কে।

(খ) কে উন্মাদ বালককে যন্ত্রণায় ছুটতে দেখেছেন?

(অ) ভগবানের দূত (আ) ভগবান (ই) কবি।

২. একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(ক) শক্তের অপরাধের কোনো প্রতিকার হয় না কেন?

(খ) তরুণ বালকের নিষ্ফল মাথাকুটার দৃশ্য দিয়ে কাদের জীবন যন্ত্রণার ছবি আঁকা হয়েছে?

[কণ্ঠ .... ভালো?]

5.4.6 গদ্যরূপ :

আজ আমার কণ্ঠ রুদ্ধ। বাঁশি সংগীতহারা; অমাবস্যার কারা আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে লুপ্ত করেছে ; তাইতো তোমায় অশ্রুজলে জিজ্ঞেস করি যারা তোমার বায়ু বিষাচ্ছে, তোমার আলো নিভাচ্ছে তুমি কি তাদের ক্ষমা করেছ ও ভালোবেসেছ?

5.4.7 বক্তব্যসার :

দুর্বলের প্রতি অসীম মমতায় কবি ভাষা হারিয়েছেন। কবির বাঁশি থেমে গেছে। দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় কবি উদ্বিগ্ন। কবির মন তাই অস্থির দুশ্চিন্তায় ঢাকা পড়েছে। তাই তিনি স্রষ্টাকে জানিয়েছেন যে যারা লোভ-লালসার বশে শুভপথ থেকে সরে যাচ্ছে তারাই মানবসমাজের ভবিষ্যতকে কালো অন্ধকারে ঢেকে দিচ্ছে, মানবসমাজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করছে। মানুষের চেতনার আলো নিভিয়ে দিয়ে পরিবেশকে দূষিত করে কবি এক ভয়ংকর বিপন্নতার দিন আপনাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

সহমর্মিতা = সমান মনোভাব।

বিপন্ন = বিপদগ্রস্ত।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 5.3

১. **ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ**

(ক) কার কণ্ঠ রুদ্ধ?

(অ) ভগবানের (আ) কবির (ই) বালকের।

(খ) কারা তোমার বায়ু বিষাচ্ছে?

(অ) কিছু মানুষ (আ) তরুণ বালক (ই) লোভী স্বার্থপররা।

২. প্রশ্নকালে কবির চোখে জল কেন?

টীকা : সেপ্টেম্বর ১৯৩১ হিজলির বন্দিনিবাসে কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে রাজবন্দিদের সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষের বিরোধ হয়। রাতের অন্ধকারে জেলের প্রহরীরা বন্দিদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দি তারকেশ্বর সেন ও সন্তোষ মিত্রকে খুন করে এবং ২০ জনকে আহত করে।

বন্দিদের ওপর এই অমানবিক আক্রমণের প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মনুমেন্টের নীচে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসুস্থ শরীর নিয়েও সভাপতিত্ব করেন ও এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষণ দেন। এরপর জানুয়ারি ১৯৩২ হিজলি জেলে বন্দিরা রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করেন ও কবিকে এক অভিনন্দন বার্তা পাঠান। তাতে লেখেন—ধন্ধবিমূঢ় 'অবমানিতের মর্মবেদনাকে ভাষা দান করিয়াছ তুমি'। ২২শে জানুয়ারি '৩২ কবি তার উত্তর দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথ 'প্রশ্ন' কবিতাটি রচনা করেন। 'গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে'—পংক্তিটি হিজলি জেলে বন্দীদের ওপর নারকীয় আক্রমণকেই স্মরণ করায়।

5.5 আপনি যা শিখলেন

1. মানবসমাজের দুর্বল অংশকে ভালবাসতে।
2. দুর্বলদের ন্যায়বিচার দেওয়ার মত অবস্থা ও পরিস্থিতি রচনা করাই হল ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের প্রকৃত পথ।
3. সমাজ থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না করা হলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

5.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. কবির ব্যথিত হবার কারণ পাঁচটি বাক্যে উত্তর করুন।
2. রাতের অন্ধকারে অসহায় মানুষকে আক্রমণের যে ঘটনা কবির সময়ে ঘটেছিল তা দশটি বাক্যের মধ্যে লিখুন।
3. শত্রুর অপরাধের বিরুদ্ধে কেন প্রতিকার পাওয়া যায় না তা পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন।

শব্দার্থ ও টীকা

5.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

5.1

১. (ক) ই

(খ) ই

২. (ক) লোকদেখানো সম্মান জানিয়ে বিদায়।

(খ) এই পৃথিবীর শুভশক্তিকে অমান্য করে দুর্বলদের উপর অত্যাচার।

5.2

১. (ক) ই

(খ) ই

২. (ক) সবলদের দাপটে বিচারব্যবস্থা প্রভাবিত।

(খ) মানবসমাজের দুর্বল অংশের।

5.3

১. (ক) আ

২. (খ) ই

৩. (ক) দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার। দুর্বলের প্রতি মমতা।

(খ) অপরাধীরা পৃথিবীর মঙ্গলকামী শক্তির বিরুদ্ধে ; তারা চিহ্নিত। তাদের বিচ্ছিন্ন করেই উত্তরণের পথ মিলবে।

কবি পরিচিতি

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৭ই মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে তুলে ধরেন। ১৯১৩ সালে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

১৯৪১ সালের ৩১শে জুলাই কবি প্রয়াত হন।

'**প্রশ্ন**' কবিতাটি কবির '**পরিশেষ**' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সমধর্মী রচনা

রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' ও 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থের ১৮নং কবিতা। (নাগিনীরা.....)

গদ্য পাঠ

6. গদ্য পাঠ
7. গালিলিয়
8. বিড়াল
9. শিলাইদহ থেকে
10. সব্যসাচী
11. অতীতের বোঝা

শব্দার্থ ও টীকা

6

গদ্যপাঠ

6.1 প্রস্তাবনা

আমরা ব্যবহারিক জীবনে, মুখে সব সময় যে ভাষায় কথা বলি তা গদ্য ভাষা। গদ্য ভাষা মাত্রেই সাহিত্যের ভাষা নয়। গদ্য ভাষা যখন আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমা ছাড়িয়ে তার মধ্যে চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতি প্রকাশ করে তখন সেই গদ্য সাহিত্যিক গদ্য হয়ে ওঠে।

বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগে সাহিত্যচর্চার মাধ্যম ছিল ছন্দবদ্ধ রচনা যা পদে বাঁধা থাকত বলে তাকে বলা হয় পদ্য। গদ্য ছিল মুখের, দলিল দস্তাবেজের এবং চিঠিপত্রের ভাষা। পোর্তুগিজ ও ইংরেজ মিশনারিদের হাতে বাংলা গদ্য লেখার সূচনা। উইলিয়াম কেরির নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম ব্যাপক ভাবে গদ্যে বই লেখা শুরু হয়। আরবি-ফারসি-সংস্কৃত শব্দ-বহুল সে-সব গদ্যের ভাষা অতি দুর্বোধ্য। উদ্ভব ও বিকাশের পথ ধরে বাংলা সাহিত্যে ক্রমে গদ্যের আবির্ভাব ঘটে। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের বিশিষ্ট লেখক।

দুর্বোধ্য = বোঝা কঠিন।
উদ্ভব = উৎপত্তি

6.2 উদ্দেশ্য

পাঠটি পড়ে আপনি :

- বাংলা গদ্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা করতে পারবেন;
- মুখের গদ্য ভাষার সঙ্গে সাহিত্যিক গদ্য ভাষার পার্থক্য করতে পারবেন;
- বাংলায় গদ্যে লেখা প্রথম দিককার বই সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন;
- যাঁদের হাত ধরে বাংলা গদ্য চলতে শুরু করল তাঁদের সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- বাংলা গদ্য সাহিত্যের সাধু রীতি ও চলিত রীতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবেন;
- বাংলা উপন্যাস ও উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন;
- বাংলা ছোটোগল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন;
- বাংলা নাটকের বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা

6.3 বিষয়ের রূপরেখা

6.3.1 সাধুগদ্য ও চলিত গদ্য

বাংলা গদ্য ধারা প্রধানত ২টি রীতিতে লিখিত হয়— সাধুগদ্যরীতি ও চলিত গদ্যরীতি। সাধুগদ্যরীতি হল লিখিত গদ্যের এমন রীতি যাতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব খুব বেশি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত গদ্যে ছিল সাধু রীতির প্রভাব। সাধু গদ্যরীতিতে যাঁরা অবদান রেখেছিলেন এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফোর্ট উইলয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠী, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির জন্য আপনি যে বাংলা পাঠ্য বইটি ব্যবহার করবেন তার মধ্যে 'গ্যালিলিয়', 'বিড়াল', 'সব্যসাচী' রচনাগুলি সাধু গদ্যে রচিত।

অন্যদিকে চলিত গদ্যে কথ্য ভাষার প্রচলিত ভঙ্গি প্রাধান্য পায়। এ জন্য চলিত রীতিতে সংস্কৃত নয় এমন অনেক শব্দ অনায়াসে ব্যবহৃত হয়। চলিত রীতির গদ্যে চলার বেগ প্রবল বলে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামপদগুলিকে ছোটো করে নেওয়া হয়।। অন্য দিকে সাধুভাষার বেগ একটু মন্থর। তাই সেখানে দীর্ঘ ক্রিয়াপদ ও দীর্ঘ সর্বনাম পদ বসে। যেমন, 'তাহারা খাইয়াছে', কিন্তু চলিত ভাষায় এই বাক্যটি হয় 'তারা খেয়েছে'।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি লেখকরা কথ্য ভাষাকে লেখার কাজে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। কথ্য ভাষায় প্যারীচাঁদ মিত্র 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে লিখলেন 'আলালের ঘরের দুলাল'। উৎকৃষ্ট চলিত গদ্য না হলেও এই গ্রন্থের ভাষা 'আলালী ভাষা' রূপে খ্যাতিলাভ করে। চলিত ভাষার বিখ্যাত লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ। প্যারিচাঁদ মিত্রের চলিত গদ্যে সাধু ও চলিতের মিশ্রণ আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্য সাধু ও চলিতের মিশ্রণ থেকে মুক্ত। তাঁর চলিত ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। চলিত রীতি বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্ব পায় প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' পত্রিকার মাধ্যমে। আপনার পাঠ্য বই-এর 'শিলাইদহ থেকে', 'অতীতের বোঝা', 'অনাচার' ইত্যাদি চলিত ভাষায় লেখা।

বাংলা গদ্য ভাষা বিকাশের প্রধান ধারাগুলি হল— (ক) কথাসাহিত্য (খ) প্রবন্ধ সাহিত্য (গ) নাট্য সাহিত্য। নীচে এই ৩টি ধারা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

পাঠগত প্রশ্ন : 6.1

ক) একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) বাংলা গদ্যের লিখনরীতি কী কী?

(২) কোন্ সময় পর্যন্ত সাধু গদ্য রীতি প্রধান ছিল?

(৩) চলিত গদ্যে কোন্ রীতি প্রাধান্য পায়?

(৪) চলিত গদ্য রীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদগুলি কেমন হয় দুটি উদাহরণ দিয়ে দেখান।

(৫) চলিত গদ্য ভাষার একজন বিশিষ্ট লেখকের নাম করুন।

খ) শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান:

(১) বাংলা গদ্যের সূচনা পর্বের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে আছেন ১. ....., ২. .....।

(২) 'আলালী ভাষা' হচ্ছে .....।

(৩) সাধু গদ্য ও চলিত গদ্যের একটি পার্থক্য হল সাধুগদ্যে ....., চলিত গদ্যে .....।

(৪) কালীপ্রসন্ন সিংহের চলিত গদ্যের রূপটি পাওয়া যায় ..... বইটিতে।

6.3.2 বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিভাজন

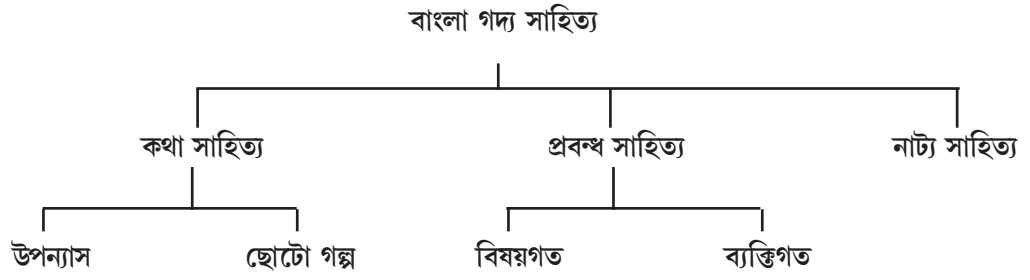

কথা সাহিত্য :

কথা সাহিত্যের প্রধান দুটি ধারা— (ক) উপন্যাস (খ) ছোটোগল্প।

উপন্যাস:

ঘটনার ঘনঘটায় আধুনিক গদ্যে রচিত মানবজীবনের বাণীরূপ হল উপন্যাস। প্লট, চরিত্র, সংলাপ, মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত, পটভূমি ও জীবনদর্শন— এই ৬টি উপন্যাসের উপাদান।

প্লট = এখানে মূল কাহিনি-সূত্র।

হ্যানা ক্যাথরিন মুলেন্সের লেখা বাংলায় প্রথম উপন্যাস 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২)। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) প্রথম দিকের রচিত উপন্যাস, যদিও কোনটিই সার্থক উপন্যাস নয়। বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঊনবিংশ শতকের তিনিই শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তিনি পূর্ববর্তী কোনো রচনার ধারাকে অনুসরণ করেননি। বরং তাঁর উপন্যাস রচনার ধারা পরবর্তী রচয়িতাদের দ্বারা অনুসৃত হয়েছে। তাঁর ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রোমান্স রসাশ্রয়ী উপন্যাসের ধারা ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছে।

অনুসৃত = অনুসরণ করা হয়েছে।

বিষয় অনুসারে বাংলা উপন্যাসের প্রধান ধারাগুলি হল ঐতিহাসিক উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস, রোমান্সধর্মী উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, আঞ্চলিক উপন্যাস প্রভৃতি। কয়েক ধরনের উপন্যাসের সংজ্ঞা নীচে দেওয়া হল।

ঐতিহাসিক উপন্যাস:

ইতিহাসের কাহিনি ও মানবচরিত্রের সার্থক সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের মতে 'ইতিহাসের সত্য' এবং 'মানব সত্যের' সার্থক মিশ্রণেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব। একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ' (১৮৮২)

ঐতিহাসিক = ইতিহাস সংক্রান্ত।

সামাজিক উপন্যাস:

একটি বিশেষ সামাজিক কাঠামো, সামাজিক চরিত্র এবং সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত অবলম্বনে রচিত উপন্যাসকে বলা হয় সামাজিক উপন্যাস। সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে সমাজ সম্পর্কে লেখকের একটি বিশেষ বক্তব্য থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) সামাজিক উপন্যাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া রোমান্সধর্মী উপন্যাসে বাস্তবের চেয়ে কল্পনা প্রাধান্য পায়— যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'। রাজনৈতিক উপন্যাসে কোনো রাজনৈতিক পটভূমি ব্যবহৃত হয়। যেমন, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' আঞ্চলিক উপন্যাসে কোনো বিশেষ এলাকার জনজীবনের বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পায়। যেমন তারাশঙ্করের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'।

ঘাত-প্রতিঘাত = ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

শব্দার্থ ও টীকা

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 6.2

ক) দুটি অংশ ঠিকমতো যুক্ত করুন :

(১) বাংলা গদ্য সাহিত্যকে প্রধান	(i) কথা সাহিত্যে একটি ভাগ।
(২) কথা সাহিত্যের প্রধান একটি ধারা	(ii) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
(৩) প্রবন্ধ সাহিত্য	(iii) তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।
(৪) বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা	(iv) রাজসিংহ।
(৫) বাংলায় একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম	(v) ছোটোগল্প।

6.3.3 ছোটোগল্প :

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে ছোটোগল্পের জন্ম। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শিল্পকর্ম ছোটোগল্প। ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি হল— (ক) ছোটোগল্পে একটি মাত্র বস্তুকে একমুখীভাবে পাওয়া যাবে। (খ) গল্পের মধ্যেকার অন্যান্য ঘটনা ও চরিত্রগুলি একমুখীনতাকে সাহায্য করবে। (গ) ছোটোগল্পে একটি মাত্র চরমক্ষণ (Climax) থাকবে। (ঘ) এর শুরু হবে হঠাৎ এবং ব্যাপ্তির মধ্যে থাকবে অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাই ছোটোগল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা—

চরমক্ষণ = সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি।
ব্যাপ্তি = প্রসার, ছড়ানো।
সংজ্ঞা = পরিচয় জ্ঞাপক।
বিস্মৃতি = ভুলে যাওয়া।

''ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখকথা'
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।''

রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম লেখক। তাঁর 'অতিথি', 'কঙ্কাল', 'নষ্টনীড়', 'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রভৃতি গল্পগুলি ছোটোগল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর পরে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছোটোগল্পের বিশিষ্ট লেখক। আপনার পাঠ্য বই-এর 'কালাপাহাড়' ও 'অনাচার' বাংলা ছোটোগল্পের দুটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

পাঠগত প্রশ্ন : 6.3

ক) শূন্যস্থানে যথাযথ তথ্য দিয়ে পূরণ করুন :

(১) ছোটোগল্পের জন্ম হয় .....।
(২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যটি লিখেছেন .....।
(৩) কয়েকটি ছোটোগল্পের নাম .....।
(৪) ছোটোগল্পে চরমক্ষণ .....।

খ) নীচের প্রশ্নগুলির দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞামূলক কবিতাটি লিখুন।

(২) ছোটোগল্পের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(৩) ছোটোগল্পে কীসের ব্যঞ্জনা থাকে?

শব্দার্থ ও টীকা

6.3.4 প্রবন্ধ :

গদ্যসাহিত্যের আর-একটি উল্লেখযোগ্য ধারা প্রবন্ধ। প্রবন্ধ মানে প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন যুক্ত রচনা। কোনো একটি বিশেষ বিষয়কে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোয় উপস্থাপিত করা এবং যুক্তি ও তথ্য দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হল প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। রচনারীতির দিক থেকে প্রবন্ধকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়— (ক) বিষয়গত ও (খ) ব্যক্তিগত।

কাঠামো = ছক।

6.3.5 বিষয়গত বা বস্তুগত প্রবন্ধ :

যে প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে কোনো বিষয় বা বস্তুকেই উপস্থাপিত করা হয় তাকে বলা হয় বিষয়গত প্রবন্ধ। বিষয়গত প্রবন্ধে কোনো বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। তাই এখানে তথ্য ও যুক্তির প্রাধান্য দেখা যায়।

উপস্থাপিত = উপস্থিত করা হয়েছে।

6.3.6 ব্যক্তিগত ও আত্মগত প্রবন্ধ :

ব্যক্তিগত প্রবন্ধে বিষয় অপেক্ষা লেখকের ব্যক্তিহৃদয়কেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে এই শ্রেণির প্রবন্ধে যুক্তি ও তথ্যের বদলে কল্পনাপ্রবণতা, আত্মগত চিন্তাভাবনা, ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রাধান্য পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিচিত্র প্রবন্ধে’র অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি ব্যক্তিগত বা আত্মগত প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া প্রবন্ধ বিভাগে আছে স্মৃতিমূলক, ভ্রমণসাহিত্য, সাহিত্য সমালোচনা মূলক, রাজনীতিমূলক, ডায়েরি, পত্রাবলি ইত্যাদি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ঊনবিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক। স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জীবন-স্মৃতি’। ‘রাশিয়ার চিঠি’ পত্র-সাহিত্যের, ‘সাহিত্যের পথে’ সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধের উদাহরণ।

আত্মগত = নিজের সম্বন্ধে।
প্রকৃষ্ট = বিশেষ উপযুক্ত।
প্রাবন্ধিক = প্রবন্ধ লেখেন যিনি।

পাঠগত প্রশ্ন : 6.4

ক) নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) প্রবন্ধকে ক'টি ভাগে ভাগ করা যায়?

(২) বিষয়গত প্রবন্ধে কার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়?

(৩) একটি বিষয়গত প্রবন্ধের উদাহরণ দিন।

(৪) একটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের উদাহরণ দিন।

(৫) তিনজন প্রাবন্ধিকের নাম লিখুন।

খ) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

(১) প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য কী?

(২) বিষয়গত প্রবন্ধ কাকে বলে?

শব্দার্থ ও টীকা

(৩) ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যটি লিখুন।
(৪) বিষয়গত এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ছাড়াও আরও দুই প্রকার প্রবন্ধের উল্লেখ করুন।
(৫) 'জীবন-স্মৃতি' কোন্ শ্রেণির প্রবন্ধের অন্তর্গত?

6.3.7 নাট্যসাহিত্য :

বাংলা সাহিত্যের আর-একটি ধারা— নাটক :

বাংলায় নাটকের আবির্ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। নাটক একটি দৃশ্যকাব্য। তবে তা বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নয়। নাট্যকার ঘটনা ও চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে বাস্তবের একটি চিত্র তুলে ধরেন। দর্শকের কাছে ওই ঘটনা ও চরিত্রগুলি অতি পরিচিত বলে মনে হয়। নাট্যকার নাটকের মধ্যে দিয়ে নাটকের দ্বন্দ্বের ভাবটি ফুটিয়ে তোলেন।

হুবহু = অবিকল।
চিত্রণ = আঁকা।
দ্বন্দ্ব = পরস্পরের বিরুদ্ধতা।

(i) বাংলা নাটকের শ্রেণিবিভাগ:

ট্রাজেডি, কমেডি, প্রহসনধর্মী প্রভৃতি নানাধরণের নাটক বাংলায় রচিত হতে থাকে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

(ii) ট্রাজেডি :

একটি বিরাট চরিত্রের পতনের কাহিনিই হল ট্রাজেডি। মানুষ অজ্ঞানতাবশত কোনো ভুল বা অন্যায় করে নিশ্চিত ধ্বংস বা মৃত্যুকে ডেকে আনে। সব কিছুকে হারিয়ে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ট্রাজেডির পরিণতি বিয়োগান্ত হতে পারে, কিন্তু বিয়োগান্ত হলেই ট্রাজেডি হয় না। ট্রাজেডির চরিত্রটি হবে—

বিয়োগান্ত = মৃত্যুতেই শেষ।

ক) ভালো ও মন্দের মাঝামাঝি;
খ) চরিত্রটির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রকাশ পাবে;
গ) চরিত্রটি হবে বাস্তবসম্মত;
ঘ) চরিত্রটির আচরণ থাকবে দ্বন্দ্বময়।

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' একটি সার্থক ট্রাজেডি নাটক। পরিণতিতে করুণ রসের সৃষ্টি হয়েছে। কুঞ্জের হাতে কুকুরের কামড়ে দেওয়া এবং রক্তপাত, প্রধানের যন্ত্রণা, রাধিকার সমবেদনা একদিকে দর্শকের মনে বেদনা জাগায়, আবার দুঃখের মধ্যেও রাধিকার পতিপ্রেম দর্শকের মনে আনে এক প্রশান্তি যা ট্রাজেডির লক্ষণ।

(iii) কমেডি :

অসঙ্গতি = বেখাপ্পা।

কমেডি গ্রিক শব্দ, এর পরিণতি মিলনান্তক। কথার সঙ্গে কাজের, প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির যে অসঙ্গতি, তার থেকেই জন্ম হয় কমেডির। কমেডি নাটকের পরিণতি হাস্যরস। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক', রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'শেষরক্ষা' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কমেডির উদাহরণ। কমেডিতে হাসির আড়ালে থাকে প্রচ্ছন্ন বেদনা।

(iv) প্রহসন :

প্রহসনও কমেডি পর্যায়ের। তবে এখানে থাকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের প্রাধান্য। মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের চমৎকার উদাহরণ।

(v) একাঙ্ক নাটক :

একটি মাত্র সমস্যা বা একটি মাত্র মুহূর্তের চিত্রণ ঘটে একাঙ্ক নাটকে। বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' একাঙ্ক নাটকের চমৎকার দৃষ্টান্ত। আপনার পাঠ্য বইয়ের উৎপল দত্ত রচিত 'নীলকণ্ঠ' নাটকটি একাঙ্ক নাটক।

(vi) পৌরাণিক নাটক :

সাধারণভাবে পুরাণ কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটককে বলা হয় পৌরাণিক নাটক। পৌরাণিক নাটকে দেবতাদের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়। তবে পুরাণের কাহিনি থাকলেই পৌরাণিক নাটক হবে না। কাহিনিতে থাকতে হবে ভক্তিরসের প্রাধান্য। দৈবশক্তির কাছে মানবশক্তি পরাজিত হয়। বাংলায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাট্যকার। 'জনা', 'বিল্বমঙ্গল' গিরিশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ছাড়াও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পৌরাণিক নাটকের বিশিষ্ট রচয়িতা।

শব্দার্থ ও টীকা

অঙ্ক [illegible]কর একটি অংশ।

মাহাত্ম্য = মহিমা।

দৈবশক্তি = দেবতা প্রদত্ত বা অলৌকিক শক্তি।

(vii) ঐতিহাসিক নাটক :

ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাসের কাহিনি বা চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাটক। তবে ইতিহাসের কাহিনির মধ্যে মানব রস সঞ্চারিত না হলে ঐতিহাসিক নাটক সার্থক হয় না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেষ্ঠ রূপকার এবং তাঁর লেখা 'শাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক।

(viii) সামাজিক নাটক :

যে নাটকে সমাজচিত্রের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে তাকে সামাজিক নাটক বলে। সামাজিক নাটকের আঙ্গিকে মানবজীবনের দ্বন্দ্বই প্রধান হয়ে ওঠে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' সামাজিক নাটকের একটি সার্থক দৃষ্টান্ত। এছাড়া দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে', তুলসী লাহিড়ির 'ছেঁড়া তার', বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটক।

(ix) রূপক-সাংকেতিক নাটক :

যে নাটকে একটি বক্তব্য বা বিষয়কে প্রকাশের জন্য একটি রূপক বা সাংকেতিকতার সাহায্য নেওয়া হয় তাকে বলা হয় রূপক-সাংকেতিক নাটক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' রূপক-সাংকেতিক নাটকের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সাংকেতিক = ইশারা ইঙ্গিতে বলা হয়েছে এমন।

পাঠগত প্রশ্ন : 6.5

ক) নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) বাংলায় নাটকের জন্ম কোন্ সময় থেকে?

(২) নাটকের শ্রেণিবিভাগগুলি লিখুন।

(৩) একটি ট্রাজেডি নাটকের উল্লেখ করুন।

(৪) কমেডি কোন্ ভাষার শব্দ লিখুন।

(৫) কমেডি নাটকের পরিণতি কী?

(৬) 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'— এটি কোন্ ধরণের নাটক?

(৭) নীলদর্পণ কোন্ শ্রেণির নাটক?

(৮) পৌরাণিক নাটকটি কার লেখা— কোন্ শ্রেণির নাটক?

(৯) একটি ঐতিহাসিক নাটকের নাম লিখুন।

শব্দার্থ ও টীকা

(১০) 'প্রফুল্ল' নাটকটি কার লেখা— কোন শ্রেণির নাটক?

(১১) রূপক সাংকেতিক নাটকে বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশের জন্য নাট্যকার কীসের সাহায্য নেন?

খ) নীচের প্রশ্নগুলির দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) নাটকে নাট্যকার কী ফুটিয়ে তোলেন?

(২) ট্রাজেডি চরিত্রের লক্ষণগুলি লিখুন।

(৩) কমেডি ও প্রহসনের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

(৪) ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে? একটি সামাজিক নাটকের নাম লিখুন।

(৫) রূপক-সাংকেতিক নাটক কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

6.4 আপনি যা শিখলেন

1. বাংলা গদ্য ভাষার জন্ম-সময়ের কথা;
2. বাংলা গদ্য ভাষার জন্মের প্রথম লগ্নে কী ধরণের গদ্য রচিত হয়েছিল;
3. প্রথম দিককার বাংলা গদ্যে লেখা বইগুলির নাম;
4. গদ্য লেখকদের কথা;
5. বাংলা গদ্যের সাধু ও চলিত রীতি রূপটি সম্বন্ধে ধারণা;
6. বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন, শ্রেণিবিভাগ, বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা লাভ;
7. বাংলা ছোটোগল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্যের রূপরীতির জ্ঞান;
8. বাংলা নাটকের শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্যগুলির ধারণা।

6.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলির অনধিক আটটি বাক্যে উত্তর দিন :

1. বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে অনধিক আটটি বাক্য লিখুন।
2. বাংলা গদ্যে চলিত গদ্যরীতি কখন থেকে শুরু হয়? বাংলাতে চলিত গদ্য রীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।
3. উপন্যাস কী? উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
4. ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে ছোটোগল্পের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি লিখুন।
5. বিষয়গত ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পার্থক্য লিখুন, একটি করে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।
6. নাটক কী? নাটকের শ্রেণিবিভাগগুলি লিখুন।
7. ট্রাজেডি ও কমেডি নাটকের পার্থক্য দেখান।
8. ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিন।

শব্দার্থ ও টীকা

6.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

6.1

ক) (১) সাধু ও চলিত।
(২) ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।
(৩) কথ্য ভাষার প্রচলিত ভঙ্গি।
(৪) (i) উহারা (সাধু) - ওরা (চলিত), (ii) লিখিত (সাধু) - লিখত (চলিত)
(৫) প্রমথ চৌধুরী।

খ) (১) (১) প্যারীচাঁদ মিত্র, (২) কালীপ্রসন্ন সিংহ।
(২) 'আলালের ঘরে দুলাল' গ্রন্থের ভাষা।
(৩) সংস্কৃত রীতির প্রাধান্য, চলিত গদ্যের ভঙ্গি।
(৪) 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য়।

6.2

ক) (১) — (iii)
(২) — (v)
(৩) — (i)
(৪) — (ii)
(৫) — (iv)

6.3

ক) (১) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন।
(২) 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতায়।
(৩) 'অতিথি', 'কঙ্কাল', 'নষ্টনীড়'।
(৪) একটি।

খ) (১) 6.3.3-এর ছোটোগল্প অংশের প্রথম অনুচ্ছেদটি দেখুন।
(২) 6.3.3-এর ছোটোগল্প অংশের প্রথম অনুচ্ছেদটি দেখুন।
(৩) শুরু হঠাৎ— শেষ হঠাৎ— ব্যাপ্তির মধ্যে অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা।

6.4

ক) (১) দুটি।
(২) বিশেষ কোনো বিষয়ের উপর।
(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ।

শব্দার্থ ও টীকা

(৪) বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'।

(৫) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত।

খ) (১) 6.3.5-এর প্রবন্ধ অংশের প্রথম অনুচ্ছেদটি দেখুন।

(২) 6.3.5-এর 'বিষয়গত প্রবন্ধে'র অংশটি দেখুন।

(৩) 6.3.6-এর 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধে'র অংশটি দেখুন।

(৪) (i) ভ্রমণ সাহিত্যমূলক 'রাশিয়ার চিঠি', (ii) সাহিত্য আলোচনামূলক 'সাহিত্য পথে'।

(৫) স্মৃতিমূলক।

6.5

ক) (১) ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।

(২) কমেডি, প্রহসন, একাঙ্ক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, রূপক-সাংকেতিক নাটক।

(৩) বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'।

(৪) গ্রিক শব্দ।

(৫) মিলনান্তক।

(৬) প্রহসন।

(৭) সামাজিক নাটিকা।

(৮) দেবতাদের।

(৯) চন্দ্রগুপ্ত।

(১০) 6.3.15 -এর 'সামাজিক নাটক' অংশের প্রথম অনুচ্ছেদটি দেখুন।

(১১) রূপক সাংকেতিকের।

খ) (১) 6.3.7-এর 'নাট্যসাহিত্য' অংশের প্রথম অনুচ্ছেদ'টি দেখুন।

(২) ভালো মন্দের মাঝামাঝি— চরিত্রটির বিশ্বাসযোগ্যতা— চরিত্রটি বাস্তবসম্মত— আচরণ দ্বন্দ্বময়।

(৩) 6.3.7-এর 'কমেডি' ও 'প্রহসন' অংশটি দেখুন।

(৪) 6.3.7-এর 'ঐতিহাসিক নাটক' অংশটি দেখুন।

(৫) 6.3.7-এর 'রূপক সাংকেতিক' অংশটি দেখুন।

সমধর্মী গ্রন্থ

1. গদ্য লেখকদের পরিচিতির জন্য পড়ুন 'বাংলা সাহিত্য শাখা'— শিশিরকুমার দাশ।
2. গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে সমধর্মী বই— (১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস— সুকুমার সেন, (২) বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা— গোপাল হালদার।

শব্দার্থ ও টীকা

7

গালিলিয়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

7.1 প্রস্তাবনা

আমাদের দেশে এখনও অনেকের বিশ্বাস, সব জ্ঞান বেদ-বেদান্তের মধ্যে আছে, নতুন করে জানবার বোঝবার আর কিছু নেই। এই ধরনের মানুষ সারা পৃথিবীতেই রয়েছেন, মধ্যযুগে আরও বেশি ছিলেন। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে মন্দির ও পুরোহিতদের প্রভাব খুব বেশি ছিল, এখনও তা যথেষ্ট আছে। প্রাচীন ভারতের বরাহমিহির, তাঁর গ্রন্থে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে প্রথমে ঠিক কথা বলেও পরে প্রচলিত বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, বলেছেন— গ্রহণের মূল কারণ হল 'পরমেশ্বর'। পরবর্তীকালে ব্রহ্মগুপ্ত গ্রহণের যথার্থ কারণ জানা সত্ত্বেও বলেছেন, গ্রহণের কারণ পরমেশ্বর নন— এটা অত্যন্ত মূর্খ ধারণা। ধর্মনেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে এসব কথা তাঁরা লিখেছেন। ইউরোপেও গির্জা বা চার্চ প্রায়শই নতুন ভাবনা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। সমাজে নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য তারা কুসংস্কারকে লালন করেছে, শক্তপোক্তভাবে মানুষকে বশে রেখেছে। গালিলিয়কে চার্চ কতখানি শাস্তি দিয়েছে, হেনস্থা করেছে, রচনাটিতে বিদ্যাসাগর তা দেখিয়েছেন। এমনতরো শাস্তি আরও অনেকে পেয়েছিলেন। যেমন, মুক্তমনের বিজ্ঞানী জিওর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০)-কে রোম নগরে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

গালিলিয়কে লড়তে হয়েছে শক্তিশালী চার্চের বিরুদ্ধে। আর-একটি লড়াই ছিল তাঁর নিজের মধ্যে। গির্জার চাপে তিনি যেমন কখনও কখনও আপস করেছেন, তেমনি সেই কৃতকর্মের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব হল, এই দু-রকম দ্বন্দ্বই তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে অগ্রগামী চিন্তার, গালিলিয়র বিজ্ঞান-ভাবনার।

7.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনি :

- গালিলিয়র সময়ে ইটালিসহ ইউরোপের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- তৎকালীন ইউরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থার তুলনা করতে পারবেন;

- গালিলিয়র পূর্বসূরিদের বক্তব্য সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- গালিলিয়র মতো বিজ্ঞানীরা গোঁড়া ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মনেতাদের হাতে কতখানি নির্যাতিত হয়েছেন জানতে পারবেন;
- বিজ্ঞান-জগতে গালিলিয়র দানের কথা বলতে ও লিখতে পারবেন;
- গালিলিয় কেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জনক তা বোঝাতে পারবেন;
- গালিলিয়র অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে পারবেন।

7.3 মূল পাঠ

7.3.1 ইটালির . . . উঠিলেন।

ইটালির অন্তঃপাতী পিসা নগরে, ১৫৬৪ খ্রি: অব্দে গালিলিয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা টস্কানি দেশের একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। কিন্তু তাদৃশ ঐশ্বর্যশালী ছিলেন না।

তিনি গালিলিয়কে, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত, সেই নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত করেন। পঠদ্দশাতেই, অরিস্টটলের দর্শনশাস্ত্র নিতান্ত যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া, তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল, সুতরাং তদবধি তিনি তন্মতের ঘোরতর প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিলেন।

অরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) = এখন লেখা হয় অ্যারিস্টট্‌ল (Aristotle)। তিনি বলেছিলেন, ভারী জিনিস হালকা বস্তুর চেয়ে তাড়াতাড়ি ওপর থেকে নীচে নামে। তবে মনে রাখতে হবে অ্যারিস্টট্‌ল অসাধারণ মনীষী। উদ্ভিদবিদ্যায় ও জীববিদ্যায় তাঁর দান অসামান্য। জীবজগতে মানুষের অবস্থান কোথায় তাও তিনি দেখিয়েছেন।

7.3.2 গণিতশাস্ত্রে . . . লাগিলেন।

গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তি হওয়াতে ১৬৮৯ খ্রি: অব্দে, তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত বিদ্যার অধ্যাপকরূপে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তিনি, সেই অযথাভূত দর্শনশাস্ত্রের অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, প্রকৃতির নিয়মসকল প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা, সমবেত বহুসংখ্যক দর্শকসমক্ষে, তিনি তত্রব্য প্রধান দেবালয়ের উপরিভাগে বারংবার পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন, গুরুত্ব পতননিয়ামক নহে। ইহাতে অরিস্টটলের মতাবলম্বীরা তাঁহার এমন বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন যে, দুই বৎসর পরে তাঁহাকে অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হইল।

এইরূপে পিসা নগর হইতে অপসারিত হইয়া, গালিলিয় বিষয়কর্মশূন্য হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শব্দার্থ ও টীকা :

গুরুত্ব পতননিয়ামক নহে = বস্তুর ভার কম-বেশি হবার উপর উঁচু থেকে নীচে পড়ার গতিবেগ নির্ভর করে না।

শব্দার্থ ও টীকা :

গালিলিয় (Galileo) = জন্ম-১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু-১৬৪২।
ইটালি = দক্ষিণ ইউরোপের একটি দেশ, রাজধানী রোম।
অন্তঃপাতী = অন্তর্গত।
নিয়োজিত করেন = ভরতি করান।
পঠদ্দশাতে = পড়াশুনোর সময়।
দর্শনশাস্ত্রে = যুক্তি ও প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যা বা তত্ত্ব। আগেকার দিনে বিজ্ঞানকেও দর্শন বলা হত।
দৃঢ় প্রত্যয় = গভীর বিশ্বাস।
তন্মতের = তাঁর (অরিস্টটলের) মতের।

প্রতিপত্তি = এখানে অর্থ জ্ঞান।
অধিরূঢ় = আসীন, নিযুক্ত।
অযথাভূত = যে-রকম হওয়া উচিত সে রকম নয়।
তত্রব্য = তথাকার, সেখানকার।
দেবালয় = এখানে অর্থ - গির্জা।
গুরুত্ব = এখানে অর্থ - ভার বা ওজন।
বিষয়কর্মশূন্য = কর্মহীন, বেকার।

7.3.3 কিন্তু ইটালির . . . লাগিলেন।

কিন্তু ইটালীর প্রদেশান্তরীয় লোকেরা, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া, ১৫৯২ খ্রি: অব্দে, তাঁহাকে পেডুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করিলেন। এই স্থলে তিনি সুচারু রূপে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইউরোপের দূরতর প্রদেশ হইতেও শিষ্যমণ্ডলী উপস্থিত হইতে লাগিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সর্বত্র লাটিনভাষাতেই উপদেশ দিতেন। গালিলিয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া ইটালীয় ভাষা আরম্ভ করিলেন। তৎকালে এই নূতন প্রণালী অবলম্বন করাও একপ্রকার সাহসের কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

পেডুয়াতে অষ্টাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়া, তিনি পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত যে সকল নূতন নূতন নিয়ম উদ্ভাবিত করেন, তাহা তৎকাল-প্রচলিত মতের নিতান্ত বিপরীত। তথাপি তিনি, অশঙ্কিত ও অসংকুচিত চিত্তে, শিষ্যদিগকে আনুষঙ্গিক সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

একপ্রকার সাহসের . . . হইয়াছিল = অপ্রচলিত ল্যাটিনে নয়, মাতৃভাষা ইটালীয়তে গালিলিয় ছাত্রদের পড়াতেন।

প্রদেশান্তরীয় ও টীকা

প্রদেশের।
সুচারুরূপে = সুন্দরভাবে।
ল্যাটিন ভাষা = রোম-দেশের প্রাচীন ভাষা।
পরিগণিত = বিবেচিত, গণ্য।
অশঙ্কিত = নির্ভয়, নিঃশঙ্ক।
অসংকুচিত = দ্বিধাহীন।

7.3.4 জেন্‌সন . . . হইয়াছে।

জেন্‌সন নামক এক ওলন্দাজ এক অভিনব যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা অবলোকন করিলে দূরবর্তী পদার্থ সকল সন্নিহিত বোধ হয়। গালিলিয় ওইরূপ যন্ত্রের উদ্ভাবন বিষয়ে প্রস্তুত প্রায় হইয়াছিলেন; এক্ষণে, ১৬০৯ খ্রি: অব্দে, তিনি শুনিবামাত্র, উহা কী কী উপাদানে নির্মিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং এক দিবসও বিলম্ব না করিয়া, তদপেক্ষা অনেক অংশে উত্তম তথাবিধ এক যন্ত্র নির্মাণ করিলেন। এইরূপে দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হইল। ইহা পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্র অপেক্ষা অধিক উপকারক।।

গালিলিয়, এই দৃষ্টিপোষক নলাকার নূতন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রয়োগ করিয়া, দেখিতে পাইলেন চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ অত্যন্ত বন্ধুর; সূর্যমণ্ডল সময়ে সময়ে কলঙ্কিত লক্ষ হয়; ছায়াপথ সূক্ষ্ম তারকাস্তবক মাত্র; বৃহস্পতি পারিপার্শ্বিক চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত; শুক্রগ্রহের, চন্দ্রের ন্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি আছে; শনৈশ্চরের উভয় পার্শ্বে পক্ষাকার কোনো পদার্থ আছে। ওই পক্ষ এক্ষণে অঙ্গুরীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

ওলন্দাজ = হল্যান্ড দেশের অধিবাসী।
তথাবিধ = সেই রকম।
দৃষ্টিপোষক = দৃষ্টি-সহায়ক।
নভোমণ্ডলে = আকাশের দিকে (নভ - আকাশ)।
কলঙ্কিত লক্ষ হয় = কালো দাগ দেখা যায়।
ছায়াপথ = আকাশগঙ্গা। অসংখ্য তারাজগতের মধ্যে আমরা বাস করি যে-তারাজগতে তার নাম ছায়াপথ বা 'মিলকি ওয়ে' (Milky Way)।

শব্দার্থ ও টীকা :

সূক্ষ্মতারকাস্তবক = অতিশয় ক্ষুদ্র তারার ঝাঁক।
বৃহস্পতি = একটি গ্রহের নাম।
বৃহস্পতি . . . পরিবেষ্টিত = সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি। গালিলিয় বৃহস্পতি গ্রহের চারটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। উপগ্রহগুলির নাম আইও, ইউরোপা, গ্যানিমিড, ক্যালিস্টো। এই চারটিকে এখন বলা হয় গালিলিয়র চাঁদ।
শনৈশ্চরের = শনিগ্রহের।
পক্ষাকার = পাখনার মতো (পক্ষ + আকার)।
অঙ্গুরীয় = আঙটি; এখানে বলয়।

7.3.5 বোধ হয় . . . প্রচারিত হইল।

বোধ হয় গালিলিয় বহুকালাবধি মনে করিতেন, নভস্তলস্থিত বস্তুসকল যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক সেরূপ নহে। কিন্তু কোনো কালে যে এই গূঢ় তত্ত্বের মর্মোদ্ভেদ করিতে পারিবেন, তাঁহার এমন আশা ছিল না। এক্ষণে, এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণ কী অভূতপূর্ব চমৎকার ও অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, তাহা কোনো রূপেই অনুভব করিতে পারা যায় না।

১৬১১ খ্রি: অব্দে, যখন তিনি এই সকল বিষয়ের গবেষণাতে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে টস্কানির অধীশ্বরের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, পিসা প্রত্যাগমনপূর্বক, সমধিক বেতনে গণিতধ্যাপকের পদ পুনর্গ্রহণ করেন; সুতরাং তাঁহার উদ্ভাবিত বিষয়সকল ওই নগরে প্রথম প্রচারিত হইল।

শব্দার্থ ও টীকা :

অধীশ্বরের = অধিপতির, রাজার।
অনুরোধপরতন্ত্র = অনুরোধের বশবর্তী।
প্রত্যাগমনপূর্বক = ফিরে এসে।

শব্দার্থ ও টীকা

সিদ্ধান্তিত = নির্ণীত, নির্ধারিত।
নভস্তলস্থিত = আকাশে অবস্থিত। (নভ - আকাশ)
মর্মোদ্ভেদ = গভীরে অবস্থিত বিষয়ের আবিষ্কার।
অনির্বচনীয় = যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

7.3.6 কোপর্নিকস . . . ভোগ করিতে হইত।

কোপর্নিকস কেবল দৈবগত্যা যে সকল নিগ্রহ, অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন এক্ষণে গালিলিয়কে তৎসমুদায় বিলক্ষণ রূপে ভোগ করিতে হইল। তৎকালে তিনি এক গ্রন্থ প্রচার করেন; তাহাতে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন, আমি যাহা উদ্ভাবিত করিয়াছি তাদ্দ্বারা কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর যথার্থতা সপ্রমাণ হইয়াছে।

ইহাতে এই ঘটিল যে, যাজকেরা তাঁহার নামে ধর্মবিপ্লাবক বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করাতে, ১৬১৫ খ্রি: অব্দে তাঁহাকে রোম নগরীর ধর্মসভার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল। সভাধ্যক্ষেরা তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞাশৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন, আর আমি এরূপ সংঘাতক মত কদাচ মুখে আনিব না। ইহাও নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু সত্যাসত্যের নিশ্চয় নাই, সভাধ্যক্ষেরা এই উপলক্ষে তাঁহাকে পাঁচ মাস কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন; আর টস্কানির অধীশ্বর এ বিষয়ে হস্তার্পণ না করিলে, তাঁহাকে আরও গুরুতর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত।

শব্দার্থ ও টীকা :

দৈবগত্যা = দৈবাৎ, অদৃষ্টক্রমে।
যাজক = খ্রিস্টান পুরোহিত।
ধর্মবিপ্লাবক = ধর্মীয় মতামতের বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়িয়েছেন।
প্রতিজ্ঞাশৃঙ্খলে = প্রতিজ্ঞার সাহায্যে আষ্টেপৃষ্ঠে।
সংঘাতক = সাংঘাতিক, ভয়ানক।
হস্তার্পণ না করিলে = বাধা না দিলে।
নিগ্রহ = অত্যাচার।

কোপর্নিকস = এখন লেখা হয় কোপার্নিকাস (Copernicus)। তাঁর জন্ম পোল্যান্ডে, ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন বিখ্যাত একটি গির্জার যাজক। সে-সময়ে দূরবিনের আবিষ্কার হয়নি; তবু তিনি বুঝেছিলেন, পৃথিবী ও সূর্যের অন্যান্য গ্রহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়। পরে বড়ো আকারে প্রকাশ পায়। ছাপা বইটি যেদিন কোপার্নিকাসের হাতে আসে সেইদিনই তাঁর মৃত্যু হয়।

7.3.7 গালিলিয় ধর্মসভার . . . পাইলেন।

গালিলিয় ধর্মসভার অগ্রে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে কয়েক বৎসর পর্যন্ত ক্ষান্ত হইয়া রহিলেন; কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যার যে যথার্থ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার অনুশীলনে বিরত হইলেন না।

জ্যোতির্বিদ্যা = গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বিদ্যা।

পরিশেষে তিনি কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর সবিস্তর বিবরণ ভূমণ্ডলে প্রচার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন; কিন্তু কুসংস্কারাবিষ্ট বিপক্ষবর্গের বিদ্বেষভয়ে স্পষ্ট রূপে আত্মমত ব্যক্ত না করিয়া তিনজনের কথোপকথনাত্মক এক গ্রন্থ লিখিলেন।

তৎকালে গালিলিয়র বয়ঃক্রম ছেষট্টি বৎসর, তথাপি স্বয়ং সেই গ্রন্থ লইয়া, ১৬৩০ খ্রি: অব্দে, রোম নগরে গমন করিলেন। তিনি ধর্মাধ্যক্ষদিগের অসম্ভাবনীয় অনুগ্রহোদয় সহকারে গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অনুমতি পাইলেন।

শব্দার্থ ও টীকা :

কথোপকথনাত্মক = পরস্পরের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে যা প্রকাশিত। 'কথোপকথনাত্মক' বইটি প্রকাশিত হয় ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে।
ধর্মাধ্যক্ষ = ধর্মীয় প্রধান।
অসম্ভাবনীয় = যা সম্ভব নয়।
অসম্ভাবনীয় অনুগ্রহোদয় = যে-দয়া সম্ভব ছিল না সেই দয়ার প্রকাশ।

শব্দার্থ ও টীকা

সবিস্তর = সুবিস্তৃত ভালোমতো।
উৎসুক = আগ্রহী।
কুসংস্কার = যুক্তিহীন ভুল ধারণা ও ধর্মবিশ্বাস।
কুসংস্কারাবিষ্ট = (কুসংস্কার + আবিষ্ট) কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।
বিদ্বেষ = হিংসা, শত্রুতা।
আত্মমত = নিজের মত বা বক্তব্য।
ব্যক্ত = প্রকাশ।

7.3.8 কিন্তু উক্ত . . . নিক্ষিপ্ত করিলেন।

কিন্তু, উক্ত পুস্তক রোম ও ফ্লোরেন্স নগরে প্রচারিত হইবামাত্র অরিস্টটলের মতাবলম্বীরা এককালে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল; তন্মধ্যে পিসার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক সর্বাপেক্ষা অধিক বিপক্ষতা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সমুদয় কার্ডিনল মংক ও গণিতজ্ঞগণের উপর গালিলিয়র গ্রন্থ পরীক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইল। তাঁহারা, অসন্দিগ্ধ চিত্তে সেই গ্রন্থকে ঘোরতর ধর্মবিপ্লাবক স্থির করিয়া, রোম নগরে ধর্মসভার অগ্রে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

গালিলিয় তৎকালে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন।, এবং তাঁহার প্রতিপোষক বন্ধু দ্বিতীয় কস্‌মো পরলোকযাত্রা করাতে, নিতান্ত নিঃসহায় হইয়াছিলেন; সুতরাং এই সমস্ত অসম্ভাবিত বিপৎপাত তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল।

বিপক্ষেরা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করাতে, ১৬৩৩ খ্রি: অব্দের শীতকালে, তাঁহাকে রোম নগরে গমন করিতে হইল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, ধর্মসভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

মতাবলম্বীরা = মত যাঁরা সমর্থন করছেন তাঁরা।
কার্ডিনল = খ্রিস্টধর্মের রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান ব্যক্তিকে বলা হয় পোপ। পোপের ঠিক নীচের পদে যাঁরা থাকেন তাঁদের পদবি কার্ডিনল (Cardinal)।
মংক = খ্রিস্টানদের মধ্যে ঘর-সংসার ছেড়ে যাঁরা ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন তাঁরা মংক (Monk)।
অসন্দিগ্ধ = সন্দেহ না-করা।

শব্দার্থ ও টীকা :

আজ্ঞা = আদেশ।
প্রতিপোষক = সমর্থনকারী।
নিঃসহায় = অসহায়
অসম্ভাবিত = ঘটবে বলে ভাবা যায়নি এমন, অপ্রত্যাশিত।
বিপৎপাত = বিপদের আবির্ভাব, বিপদ-ঘটা।
যৎপরোনাস্তি = যারপরনাই, অত্যন্ত।
উৎপীড়ন = অত্যাচার।

7.3.9 কয়েক মাস . . . এখনও চলিতেছে।

কয়েক মাস তথায় অবস্থিতির পর, বিচারকর্তাদিগের সম্মুখে নীত হইলে, তাঁহারা এই দণ্ডবিধান করিলেন, তোমাকে আমাদের সম্মুখে হাঁটু পাড়িয়া ও বাইবেল স্পর্শ করিয়া কহিতে হইবেক, আমি পৃথিবীর গতি প্রভৃতি যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি সে সমুদয় অস্বর্গ্য, অশ্রদ্ধেয়, ধর্মবিদ্বিষ্ট ও ভ্রান্তিমূলক। গালিলিয়, সেই বিষম সময়ে মনের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে না পারিয়া, যথোক্ত প্রকারে পূর্বনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিলেন।

কিন্তু গাত্রোত্থান করিবামাত্র, আন্তরিক দৃঢ় প্রত্যয়ের বিপরীত কর্ম করিলাম, এই ভাবিয়া মনোমধ্যে ঘৃণারোষসহকৃত যৎপরোনাস্তি অনুতাপ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি পৃথিবীতে পদাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ইহা এখনও চলিতেছে।

শব্দার্থ ও টীকা :

ধর্মবিদ্বিষ্ট = ধর্মের প্রতি শত্রুতামূলক।
ভ্রান্তিমূলক = ভুল।
যথোক্ত = যা বলা হয়েছে। (যথা + উক্ত)।
গাত্রোত্থান করা = দাঁড়ানো।
দৃঢ় = গভীর, অটল।
প্রত্যয় = বিশ্বাস।
ঘৃণারোষসহকৃত = ঘৃণা ও রাগের সঙ্গে।
ইহা এখনও চলিতেছে = পৃথিবী এখনও ঘুরছে।

শব্দার্থ ও টীকা

অবস্থিতির পর = থাকবার পর।
নীত হইলে = নিয়ে আসা হলে।
হাঁটু গাড়িয়া = হাঁটু গেড়ে।
প্রতিপন্ন = নির্ধারিত, যুক্তি দিয়ে সমর্থন।
অস্বর্গ্য = অপবিত্র।
অশ্রদ্ধেয় = সম্মানিত হবার অযোগ্য।

7.4 বিষয়ের রূপরেখা

7.4.1 বক্তব্যসার:

ইটালির মধ্যে পিসা নগর। সেখানে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে (১৫ ফেব্রুয়ারি) গালিলিয়র জন্ম। তাঁর বাবা টস্কানি দেশের সম্মানীয় মানুষ, মধ্যবিত্ত।

বাবা তাঁকে পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়তে পাঠালেন। ছাত্র অবস্থাতেই তাঁর বিশ্বাস জন্মাল, অ্যারিস্টট্‌লের বৈজ্ঞানিক মতামত যুক্তিসঙ্গত নয়। তখন থেকেই তিনি অ্যারিস্টট্‌লের ঘোর বিরোধী।

7.4.2 মন্তব্য:

১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে গালিলিয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর বাবার আশা ছিল, ছেলে ডাক্তারি পড়ার পর ভালো রোজগার করবে। কিন্তু গালিলিয়র মন গেল গণিত ও পদার্থবিদ্যার দিকে।

পাঠগত প্রশ্ন 7.1

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) গালিলিয় জন্মেছিলেন ..... নগরে।
(খ) পিসা নগর ছিল ..... মধ্যে।
(গ) ছাত্র অবস্থাতেই গালিলিয়র বিশ্বাস জন্মাল, ... তত্ত্ব ভুল।
(ঘ) অ্যারিস্টট্‌লের মতে চাঁদ .....।

শব্দার্থ ও টীকা

২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

(ক) গালিলিয় কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলেন? (পিসার/ পেডুয়ার/ ভেনিসের/ রোমের)

(খ) গালিলিয় কী পড়তে গিয়েছিলেন? (আইন/ চিকিৎসাবিদ্যা/ দর্শন/ বিজ্ঞান)

৩) এক কথায় উত্তর দিন—

(ক) অ্যারিস্টট্‌ল কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

(খ) অ্যারিস্টট্‌ল কোন্ দেশের অধিবাসী?

(গ) গালিলিয় কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

(ঘ) গালিলিয়র কোন্ বছর মৃত্যু হয়?

(ঙ) 'সম্ভ্রান্ত' কথাটির অর্থ কী?

৪) গালিলিয় অ্যারিস্টট্‌লের বিরোধী হলেন কেন? (দুটি বাক্যে উত্তর দিন)

7.4.3 বক্তব্যসার:

পিসা বিদ্যালয়ে গালিলিয়কে ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকপদ দেওয়া হল। এই সুযোগে তিনি প্রকাশ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখালেন, প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে অ্যারিস্টট্‌লের বক্তব্যের মিল নেই।

গালিলিয়র বহুজনের সামনে পিসার প্রধান মন্দিরের উপর থেকে পরীক্ষা করে দেখালেন, দুটি অসম ভারের বস্তু একই মুহূর্তে নীচে ফেললে তারা একই সঙ্গে মাটিতে পড়বে। এই পরীক্ষা অ্যারিস্টট্‌লপক্ষীয়দের চটিয়ে দিল। পরিণামে অধ্যাপকপদ ছেড়ে দিতে তিনি বাধ্য হলেন।

7.4.4 মন্তব্য:

বিদ্যাসাগর পিসার হেলানো গম্বুজের উপর থেকে গালিলিয়র পরীক্ষার কথা বলেছেন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হল, একটি পাথরের টুকরো ও একটি পালক বায়ুশূন্য অবস্থায় একই সঙ্গে নীচে পড়বে। অবশ্য গালিলিয় নিজের অনেক পরীক্ষার কথা লিখে গেছেন, কিন্তু এই পরীক্ষার কথা কোথাও লেখেননি।

পাঠগত প্রশ্ন 7.2

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গালিলিয় ..... অধ্যাপক ছিলেন।

(খ) প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে ..... বক্তব্যের মিল নেই।

(গ) ..... হেলানো গম্বুজ থেকে গালিলিয় পরীক্ষা করেছিলেন।

(ঘ) গালিলিয় প্রমাণ করলেন, শব্দের ..... পরিমাপ করা যায়।

২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

(ক) পিসা বিদ্যালয়ে গালিলিয় কত সালে অধাপক-পদে যোগ দেন? (১৮৫৭/ ১৫৮৮/ ১৫৮৯/ ১৫৯০)

শব্দার্থ ও টীকা

(খ) অধ্যাপক-পদে কত বছরের জন্য গালিলিয় চুক্তিবদ্ধ ছিলেন? (এক/ দুই/ তিন/ চার)।

৩) আলোচ্য রচনায় 'প্রতিপত্তি' শব্দটিকে কোন্ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?

৪) অনধিক তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন—

(ক) গালিলিয়কে কেন অধ্যাপক-পদ ছেড়ে দিতে হয়েছিল?

(খ) গালিলিয়র বিখ্যাত পরীক্ষাটির বিবরণ দিন।

7.4.5 বক্তব্যসার:

ইটালির অন্য প্রদেশে গালিলিয়র গুণমুগ্ধ প্রভাবশালী বন্ধুরা ছিলেন। তাঁদেরই কেউ কেউ তাঁকে ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে ভেনিসের পেডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করলেন। এখানে গালিলিয়র পড়ানোর পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপের নানা দেশ থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে শিক্ষা নিতে আসেন। ইউরোপে তখন প্রাচীন ল্যাটিন ভাষায় পড়ানোর রেওয়াজ ছিল। গালিলিয় সেই রীতি ত্যাগ করে ইটালীয় ভাষায় শিক্ষা দিতে থাকেন। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে তিনি সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন।

পেডুয়াতে তিনি আঠারো বছর পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের নতুন নতুন নিয়ম তিনি তখন আবিষ্কার করেন। এই সব আবিষ্কার ছিল সে-সময়ের প্রচলিত মতামতের বিরোধী। তবু তিনি ছিলেন নির্ভীক।

7.4.6 মন্তব্য:

পেডুয়াতে তিনি হাতে কলমে দেখাতেন কোন্ বস্তু কীভাবে কাজ করছে। ছাত্ররা তাতে আকৃষ্ট হত। গণিতবিদ্যাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে তিনি ছাত্রদের নানা জিনিস শিখিয়েছেন। যেমন, কীভাবে সেতু বাঁধতে হবে, কীভাবে অট্টালিকা মজবুত করতে হবে। এইভাবে বিজ্ঞান-পাঠের নতুন দিক তিনি খুলে দিয়েছিলেন।

পাঠগত প্রশ্ন 7.3

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) পেডুয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ..... প্রদেশে।

(খ) পেডুয়ায় গালিলিয় ছিলেন ..... অধ্যাপক।

(গ) ইউরোপে তখন ..... ভাষায় পড়ানোর রীতি ছিল।

২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

গালিলিয় পেডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কত খ্রিস্টাব্দে যোগ দিয়েছেন? (১৫৯২/ ১৫৯৩/ ১৫৯৪/১৫৯৫)

৩) পেডুয়াতে গালিলিয় কত বছর অধ্যাপনা করেন? (এক কথায় উত্তর দিন)

৪) গালিলিয়র পড়ানো ছাত্রদের আকৃষ্ট করত কেন? (অনধিক তিনটি বাক্যে উত্তর দিন)

শব্দার্থ ও টীকা

7.4.7 বক্তব্যসার:

হল্যান্ড দেশের অধিবাসী জেন্‌সন এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তার মধ্য দিয়ে দেখলে দূরের জিনিস কাছের বলে মনে হয়। সে-সময়ে গালিলিয়ও ওই রকম যন্ত্র আবিষ্কারে প্রায় কৃতকার্য হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, কোন্ কোন্ উপকরণে তৈরি হয়েছে হল্যান্ডবাসীর যন্ত্র। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রস্তুত করে ফেললেন সমরূপ কিন্তু আরও উন্নত একটি যন্ত্র, আজ যার নাম দূরবীক্ষণ বা দূরবিন।

দূরবিনের নলের মধ্য দিয়ে মহাকাশ দেখলেন গালিলিয়। তিনি জানালেন, চাঁদের উপরিভাগ উঁচুনীচু, সূর্যে মাঝে-মাঝে কলঙ্ক দেখা দেয়, ছায়াপথ হল অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ঝাঁক, বৃহস্পতিকে ঘিরে পাক খাচ্ছে চারটি উপগ্রহ, শুক্রগ্রহের আছে চাঁদের মতো কমা-বাড়া, শনিগ্রহের দু-পাশে আছে পাখনা— যাকে বলা হয় শনির বলয়।

7.4.8 মন্তব্য:

মহাকাশ পর্যবেক্ষণে দূরবিনের সাহায্য নিয়ে গালিলিয় বিজ্ঞান গবেষণায় নতুন পথ দেখালেন। আজ অসাধারণ শক্তিশালী দূরবিন আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু দূরবিনের সাহায্যে আকাশ দেখার সূত্রপাত করেছিলেন গালিলিয়।

পাঠগত প্রশ্ন 7.4

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) হল্যান্ড দেশের অধিবাসী ..... এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

(খ) ..... খ্রিস্টাব্দে গালিলিয় দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করেন।

(গ) বৃহস্পতিকে ঘিরে পাক খাচ্ছে ..... উপগ্রহ।

(ঘ) যে-তারামণ্ডলে পৃথিবী অবস্থিত তার নাম ..... ।

(ঙ) সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড়ো গ্রহের নাম ..... ।

২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

(ক) ছায়াপথের আর-একটি নাম কী? (আকাশগঙ্গা/ আকাশপথ/ নভোমণ্ডল)

(খ) চাঁদের উপরিতল কী রকম? (কাঁকুরে/ পাথুরে/ বন্ধুর/ মসৃণ)

(গ) সূর্যের গায়ে মাঝে মাঝে কী দেখা যায়? (কলঙ্ক/ ছিদ্র/ রামধনু/ বুদবুদ)

7.4.9 বক্তব্যসার:

গালিলিয় বোধ হয় বহুদিন ধরে ভাবছিলেন, মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদিকে যেমন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তারা তেমনটি নয়। কিন্তু তিনি কখনও আশা করেননি, ওই বস্তুগুলি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করতে পারবেন। তা যখন পারলেন তখন কী অপূর্ব আনন্দ যে তিনি লাভ করেছিলেন, তা অনুভব করা দুঃসাধ্য।

শব্দার্থ ও টীকা

১৬১১ খ্রিস্টাব্দে মহাকাশের বস্তু নিয়ে তাঁর গবেষণা শুরু হয়। ওই সময় টস্কানির রাজা তাঁকে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার গণিতের অধ্যাপক পদ নিতে অনুরোধ করেন। গালিলিয় পিসায় ফিরে আসেন। ফলে এই প্রথম তাঁর আবিষ্কারের বৃত্তান্ত পিসার মানুষ জানতে পারে।

7.4.10 মন্তব্য:

গালিলিয় খালি চোখে গ্রহ-নক্ষত্র দেখে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি চাইছিলেন অন্য উপায়ে দেখতে। সেই দেখা সম্ভব করল দূরবিন। বিজ্ঞানীদের থাকা চাই দূরদৃষ্টি বা কল্পনাশক্তি। তবেই সম্ভব হয় নতুন নতুন আবিষ্কার। দূরবিনের সাহায্যে তিনি তাঁর কল্পনাকে বাস্তব চেহারায় দেখতে পেলেন। কঠিন কাজ সুসম্পন্ন করতে পারলে মানুষ অফুরন্ত আনন্দ লাভ করে। গ্রহ-উপগ্রহের যথার্থ রূপ দেখে, সেই অনির্বচনীয় আনন্দ গালিলিয় পেলেন।

পাঠগত প্রশ্ন 7.5

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) মহাকাশের জ্যোতিষ্কদের খালি চোখে যেমন দেখা যায় তারা ..... নয়।

(খ) গালিলিয় মহাকাশের বস্তু নিয়ে নিয়মিত গবেষণা শুরু করেন ..... খ্রিস্টাব্দে।

২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

পিসায় ফিরে এসে গালিলিয় কোন্ বিষয়ের অধ্যাপক হলেন? (গণিতশাস্ত্রের/ জ্যোতির্বিদ্যার/ পদার্থবিদ্যার)

৩) গালিলিয় কেন অনির্বচনীয় আনন্দ পেলেন (দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দিন)?

7.4.11 বক্তব্যসার:

কোপার্নিকাস দৈবাৎ শাস্তি পাননি। কিন্তু গালিলিয়কে শাস্তি ভোগ করতে হল। কারণ, তিনি তখন একটি বই প্রকাশ করেছিলেন, তাতে স্পষ্ট লিখেছিলেন, তাঁর আবিষ্কার প্রমাণ করছে কোপার্নিকাসের বক্তব্য যথার্থ।

বইটি প্রকাশিত হলে যাজকরা অভিযোগ করল, গালিলিয় ধর্মের শত্রু। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে গালিলিয়কে হাজির হতে হল রোম-নগরের ধর্মসভায়, সেখানে তাঁর বিচার হবে। বিচারকর্তারা তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন, এ-রকম ভয়ংকর মতামত তিনি আর কখনও প্রচার করবেন না। বিচারক বা ধর্মনেতাদের নির্দেশে গালিলিয়কে সম্ভবত পাঁচমাস কারাগারে থাকতে হয়। টস্কানির রাজা তাঁর পক্ষ না-নিলে তাঁকে গুরুতর শাস্তি পেতে হত।

7.4.12 মন্তব্য:

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের আওতায় ছিল রোমান চার্চ। খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যেকার এই বিশেষ সম্প্রদায় ছিল খুব প্রভাবশালী। ধর্মের ব্যাপারে চার্চের প্রধানরা ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া। তাঁদের চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাসে কেউ আঘাত

শব্দার্থ ও টীকা

করলে তাঁরা সহ্য করতেন না। তাঁরা মনে করতেন, ঈশ্বর নিজের আদলে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে বসবাসের জন্য দিয়েছেন এই পৃথিবী, পৃথিবী স্থির হয়ে রয়েছে যাবতীয় সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে, আর চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র পৃথিবীর চারপাশে পাক খাচ্ছে অনুগত সেবকের মতো। চার্চের এই ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করল কোপার্নিকাস ও গালিলিয়র তত্ত্ব। সুতরাং গালিলিয়র উপর রোমান ক্যাথলিক চার্চ খড়্গহস্ত হয়ে উঠল।

পাঠগত প্রশ্ন 7.6

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) কোপার্নিকাসের জন্ম হয় ..... খ্রিস্টাব্দে।

(খ) গালিলিয়র আবিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে ..... বক্তব্য যথার্থ।

(গ) ..... খ্রিস্টাব্দে গালিলিয় রোমের ধর্মসভায় হাজির হয়েছিলেন।

২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

(ক) কোপার্নিকাসের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয় কোন্ খ্রিস্টাব্দে? (১৫৩০/ ১৫৪০/ ১৫৫০/ ১৫৫২)

(খ) কোপার্নিকাস কোন্ দেশে জন্মেছিলেন? (ইটালিতে/ পোল্যান্ডে/ হল্যান্ডে)।

(গ) গালিলিয় কতদিন কারারুদ্ধ ছিলেন? (চারমাস/ পাঁচমাস/ এক বছর/ যাবজ্জীবন)।

(ঘ) গালিলিয়র বিরুদ্ধে কারা অভিযোগ করেছিলেন? (কার্ডিনাল/ টস্কানির রাজা/ পোপ/ যাজকেরা)

৩) রোমান চার্চ কেন গালিলিয়কে শাস্তি দিল? (দুটি বাক্যে উত্তর দিন)

7.4.13 বক্তব্যসার:

গালিলিয় ধর্মসভার কাছে প্রতিজ্ঞামতো কয়েক বছর চুপচাপ থাকলেন। কিন্তু নিজের মত অনুযায়ী তিনি গবেষণা করে গেলেন। শেষে কোপার্নিকাসের মতামত প্রচার করতে তিনি খুব আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তিনি জানতেন তাঁর বিপক্ষে আছেন কুসংস্কারে অন্ধ প্রভাবশালী মানুষ, তাঁরা শত্রুতা করবেন। সুতরাং সরাসরি নিজের মত তিনি প্রকাশ করতে পারেননি। তিনি একটি বই লিখলেন যেখানে তিনটি চরিত্র পরস্পর কথা বলছে।

তখন গালিলিয়র বয়স ছেষট্টি বছর। এত বয়সেও ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি রোমে গেলেন। সেখানকার ধর্মীয় নেতারা তাঁকে বইটি প্রকাশ করতে অনুমতি দিলেন। এই অনুমতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। তবু যা অসম্ভব তা-ই সম্ভব হল।

অনুমতি পাবার পর ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

7.4.14 মন্তব্য:

গালিলিয় নিজের মতামত প্রকাশের পথ খুঁজছিলেন। তিনি তা পেলেন। কথোপকথনের ঢঙে বইটি লিখে তিনি বিপক্ষের চোখে ধুলো দিতে চাইলেন। প্রাথমিকভাবে তিনি সফলও হলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 7.7

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) গালিলিয় নিজের মত অনুসারে ..... চালিয়ে গেলেন।

(খ) গালিলিয়র বিপক্ষে ছিলেন ..... অন্ধ প্রভাবশালী মানুষ।

(গ) কথোপকথনাত্মক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ..... খ্রিস্টাব্দে।

২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

(ক) গালিলিয়র বইয়ে কার চরিত্র সবচেয়ে উজ্জ্বল? (যে-চরিত্র কোপার্নিকাসের পক্ষে/ যে-চরিত্র অ্যারিস্টট্‌লের পক্ষে/ যে-চরিত্র নিরপেক্ষ)

(খ) গ্রন্থ-প্রকাশের অনুমতি চাইতে গালিলিয় কত খ্রিস্টাব্দে রোমে গিয়েছিলেন? (১৬৩০/ ১৬৩২/ ১৬৩৪/ ১৬৩৬)

৩) গালিলিয়র বই কেন কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা হল? (অনধিক তিনটি বাক্যে উত্তর দিন)

7.4.15 বক্তব্যসার:

বইটি রোম ও ফ্লোরেন্স নগরে ভীষণ বিরোধিতার জন্ম দিল। সবচেয়ে বেশি শত্রুতা করলেন পিসায় দর্শনশাস্ত্রের এক নামকরা অধ্যাপক। সমস্ত কার্ডিনল, মংক ও গণিতজ্ঞদের বইটি সম্পর্কে রায় দিতে বলা হল। তাঁরা একবাক্যে বললেন, বইটি সাংঘাতিক ধর্মবিরোধী। তখন রোমের ধর্মসভার সামনে হাজির হবার জন্য গালিলিয়কে আদেশ দেওয়া হল।

গালিলিয় তখন সত্তর বছরের বৃদ্ধ। তার ওপর তাঁর বিশিষ্ট প্রভাবশালী বন্ধু দ্বিতীয় কস্‌মোর মৃত্যু হয়েছে। অসহায় গালিলিয় ভয়ংকর বিপদে পড়লেন। তাঁর শত্রুরা অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করলেন। গালিলিয় বাধ্য হলেন ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের শীতকালে রোমে হাজির হতে। সঙ্গে-সঙ্গে ধর্মীয় প্রধানরা তাঁকে জেলখানায় পাঠালেন।

7.4.16 মন্তব্য:

রোমান চার্চের পদস্থ ব্যক্তিরা ছিলেন গালিলিয়র বইটির বিচারক। পণ্ডিতরা ছিলেন চার্চের সহায়ক। সুতরাং গালিলিয়কে শাস্তি পেতেই হল। যাঁরা শাস্তি দিলেন তাঁরা এতই অমানবিক যে বৃদ্ধ মানুষকে অব্যাহতি দেবার কথা তাঁরা ভাবলেনও না।

পাঠগত প্রশ্ন 7.8

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) গালিলিয়র বই প্রকাশিত হলে ভীষণ বিরোধিতা এল ..... এবং ..... নগর থেকে।

শব্দার্থ ও টীকা

(খ) গালিলিয়র বইটি সম্পর্কে রায় দিতে বলা হল কার্ডিনল, ... এবং .....।

(গ) গালিলিয় ..... খ্রিস্টাব্দে বাধ্য হয়েছেন রোমে হাজির হতে।

২) এক কথায় উত্তর দিন—

(ক) গালিলিয়র সবচেয়ে বেশি শত্রুতা যিনি করেছেন তিনি কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক?

(খ) কোন্ বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু গালিলিয়কে নিঃসহায় করেছে?

৩) অনধিক তিনটি বাক্যে উত্তর দিন—

(ক) গালিলিয়কে কখন জেলখানায় যেতে হল?

(খ) গালিলিয়কে কখন রোমের ধর্মসভায় হাজির হতে হল?

7.4.17 বক্তব্যসার:

কারাগারে গালিলিয়র কয়েক মাস কাটল। তারপর তাঁকে আনা হল বিচারকদের সামনে। বিচারকরা আবার তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করে বললেন, গালিলিয়কে তাঁদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বাইবেল ছুঁয়ে বলতে হবে, তিনি তাঁর বইয়ে যা বলেছেন সবই অপবিত্র, শ্রদ্ধার অযোগ্য, ধর্মবিরোধী এবং ভুল। গালিলিয়র কাছে এ হল এক ভীষণ সংকটের সময়। তিনি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেন, বিচারকরা যেভাবে যা বলতে বলেছেন তা-ই করলেন।

কিন্তু উঠে দাঁড়ানোমাত্র তিনি নিজেকে ধিক্কার দিলেন। নিজের ওপরই জাগল তাঁর ক্রোধ। তিনি তীব্র অনুতাপের সঙ্গে মাটিতে পা ঠুকলেন; উচ্চকণ্ঠে বললেন, পৃথিবী এখনও চলছে।

7.4.18 মন্তব্য:

গালিলিয়র যাঁরা প্রতিপক্ষ তাঁরা দ্বিতীয়বার তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। বোঝা যায়, গালিলিয় তাঁদের সংস্কারে যে-ঘা দিয়েছেন তা কতখানি মোক্ষম। গালিলিয় বাধ্য হলেন হাঁটু গেড়ে বসে বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করতে। ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানের বিশ্বাস, বাইবেল স্পর্শ করে মিথ্যা-বলার সাহস কারও নেই। কিন্তু দাঁড়িয়ে ওঠার পরেই গালিলিয়র যা প্রতিক্রিয়া তাতে বোঝা গেল, তিনি নিজের মতে অবিচল। আমরা দেখলাম সংস্কারমুক্ত গালিলিয়কে। আমরা বুঝলাম, ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করা যদি-বা যায়, কিন্তু যা সত্য তা মিথ্যা হয় না। গালিলিয়র পদাঘাত থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি অত্যন্ত অস্থির।

পাঠগত প্রশ্ন 7.9

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) গালিলিয় ..... মাস কারাগারে ছিলেন।

(খ) বিচারকরা গালিলিয়কে বললেন, তোমাকে ..... ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

(গ) গালিলিয় পূর্বনির্দিষ্ট ..... উচ্চারণ করলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

(ঘ) খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম .....।

২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

(ক) বিচারকদের নির্দেশের পর গালিলিয় মনের দিক থেকে কী অবস্থায় ছিলেন? (অনুতপ্ত/ ক্রুদ্ধ/ দুর্বল)

(খ) মাটিতে পদাঘাত করে গালিলিয় কী বলেছিলেন? (চাঁদ ঘুরছে/ সূর্য স্থির/ পৃথিবী চলছে)

৩) গালিলিয়কে কেন বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করতে বলা হল? (অনধিক তিনটি বাক্যে উত্তর দিন)

7.5 আপনি যা শিখলেন

1. গালিলিয়র জীবনকথা;
2. তখনকার সামাজিক অবস্থার কথা;
3. গালিলিয়র পূর্বসূরি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের বৃত্তান্ত;
4. ধর্মীয় কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে গালিলিয়র দ্বন্দ্বের স্বরূপ ও তাৎপর্য;
5. গালিলিয়র অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয়;
6. বিদ্যাসাগরের যুক্তিশীল মানসিকতার কী বৈশিষ্ট্য;
7. আধুনিক বিজ্ঞানের জনকরূপে গালিলিয়র পরিচয়।

পাঠান্ত প্রশ্ন

1. অ্যারিস্টট্‌লের কোন্ কোন্ বক্তব্য গ্যালিলিয় ভুল প্রমাণ করেন?
2. গালিলিয়র যুগে ইউরোপের অবস্থা ও আমাদের দেশের অবস্থার মধ্যে কী মিল আপনি দেখতে পান?
3. গালিলিয়কে যে-দুটি দিকে লড়াই করতে হয়েছে উদাহরণ সহ তার পরিচয় দিন।
4. দূরবীক্ষণের সাহায্যে গালিলিয় কী কী আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলি লিখুন।
5. গালিলিয়র দূরবিন তৈরির ইতিহাস বর্ণনা করুন।
6. ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে ধর্মীয় কর্তাব্যক্তিরা গালিলিয়কে কী শাস্তি দিয়েছিলেন?
7. গালিলিয়র আবিষ্কার রোমান চার্চের কোন্ ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেছিল লিখুন।
8. কোপার্নিকাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
9. কার্ডিনল কারা?
10. মংক কারা?
11. কথোপকথনাত্মক বইটি প্রকাশের পর গালিলিয় কী শাস্তি পেয়েছিলেন?
12. 'ইহা এখনও চলিতেছে'— কী মানসিক অবস্থায় গালিলিয় এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন?

শব্দার্থ ও টীকা

7.4 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

7.1

১) (ক) পিসা
(খ) ইটালির
(গ) অ্যারিস্টট্‌লের
(ঘ) মসৃণ

২) (ক) পিসার
(খ) চিকিৎসাবিদ্যা

৩) (ক) ৪২৭ খ্রি: পূর্বাব্দে
(খ) গ্রিস
(গ) ১৬৫৪
(ঘ) ১৬৪২
(ঙ) অভিজাত

৪) অ্যারিস্টট্‌লের বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য ছিল না।

7.2

১) (ক) গণিতশাস্ত্রের
(খ) অ্যারিস্টট্‌লের
(গ) পিসার
(ঘ) গতিবেগ

২) (ক) ১৫৮৯
(খ) তিন

৩) জ্ঞান

৪) (ক) পিসার হেলানো গম্বুজ থেকে পরীক্ষা— হালকা ও ভারী বস্তু একই সঙ্গে নীচে পড়ল।
(খ) গালিলিয়র পরীক্ষায় প্রমাণিত হল অ্যারিস্টট্‌লের বক্তব্য অসঙ্গত— বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ক্রোধ ও গালিলিয়র পদচ্যুতি।

7.3

১) (ক) ভেনিস
(খ) গণিতের
(গ) ল্যাটিন

২) ১৫৯২

৩) আঠারো

৪) গালিলিয় হাতে-কলমে কাজ করে দেখাতেন— গণিতবিদ্যাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতেন— এই পদ্ধতি ছাত্রদের আকৃষ্ট করত।

শব্দার্থ ও টীকা

7.4

১) (ক) জেন্‌সন
(খ) ১৬০৯
(গ) চারটি
(ঘ) ছায়াপথ
(ঙ) বৃহস্পতি

২) (ক) আকাশগঙ্গা
(খ) বন্ধুর
(গ) কলঙ্ক

7.5

১) (ক) তেমন
(খ) ১৬১১

২) গণিতশাস্ত্রের

৩) গালিলিয় ধারণা করেছিলেন, খালিচোখে গ্রহ-উপগ্রহ-সূর্যকে যেভাবে দেখা যায় তারা আসলে তা নয়। দূরবিনের মধ্য দিয়ে তিনি দেখলেন তাঁর ধারণা ঠিক। তখন অনির্বচনীয় আনন্দ।

7.6

১) (ক) ১৪৭৩
(খ) কোপার্নিকাসের
(গ) ১৬১৫

২) (ক) ১৫৪০
(খ) হল্যান্ডে
(গ) পাঁচমাস
(ঘ) যাজকরা

৩) রোমান চার্চের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত পড়েছিল, তাই শাস্তি।

7.7

১) (ক) গবেষণা
(খ) কুসংস্কারে
(গ) ১৬৩২

২) (ক) যে-চরিত্র কোপার্নিকাসের পক্ষে
(খ) ১৬৩০

৩) গালিলিয় চাইছিলেন তাঁর বক্তব্য ধর্মীয় প্রধানরা যেন না-বুঝতে পারেন। তাই বিশেষ ধরণে বইটি লিখলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

7.8

১) (ক) রোম, ফ্লোরেন্স
(খ) মংক, গণিতজ্ঞদের
(গ) ১৬৩৩

২) (ক) পিসা
(খ) দ্বিতীয় কস্‌মোর

৩) (ক) কার্ডিনল, মংক, গণিতজ্ঞদের; গালিলিয়র বন্ধু কসমোর মৃত্যু
(খ) ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে শত্রুদের অত্যাচারে

7.9

১) (ক) কয়েক
(খ) বাইবেল
(গ) প্রতিজ্ঞাবাক্য
(ঘ) বাইবেল

২) (ক) দুর্বল
(খ) পৃথিবী চলছে

৩) (ক) ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে গালিলিয় রোমে যেতে বাধ্য হলেন— তখন তাঁকে কারাগারে পাঠানো হল।
(খ) বাইবেলের মধ্যে আছে ঈশ্বরের বাণী— বাইবেলের পবিত্রতা। বাইবেল ছুয়ে শপথ নেবার নির্দেশ।

লেখক পরিচিতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২৬.০৯.১৮২০-২৯.০৭.১৮৯১)-এর জন্ম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে। বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মা ভগবতী দেবী। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা শেষ করেন তখন তাঁর উপাধি 'বিদ্যাসাগর'। তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক। বিধবাবিবাহ প্রচলনের ও বহুবিবাহ বন্ধের জন্য বিদ্যাসাগরের সংগ্রাম স্মরণীয় হয়ে আছে। শিক্ষাপ্রসারে, বিশেষত স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে, তাঁর দান অবিস্মরণীয়। তাঁকে বলা হয় বাংলা গদ্যের জনক। বাংলা গদ্যের মধ্যে ছন্দের যে-দোলা আছে তা তাঁর কানে ধরা পড়ে। তাঁর গদ্যে এই ছন্দবোধের পরিচয় আছে। বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন: বেতালপঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, ঋজুপাঠ, জীবনচরিত, চরিতাবলি ইত্যাদি। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই হল অসমাপ্ত আত্মচরিত এবং 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'। তাঁর 'জীবনচরিত' গ্রন্থে বিজ্ঞানীদের জীবনী তিনি পরিবেশন করেছেন। এই গ্রন্থটি থেকেই 'গালিলিয়' নামক রচনাটি নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানের আলোচনায় পরিভাষা দরকার হয়। বিদ্যাসাগরকে পরিভাষা সৃষ্টি করে নিতে হয়েছে। যেমন দূরবীক্ষণ, ছায়াপথ ইত্যাদি। এই সব পরিভাষার অনেকগুলি আমরা আজ ব্যবহার করছি। বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর।

সমধর্মী রচনা

''প্রশ্ন হচ্ছে, কী নিরীক্ষণ করব, কী ভাবে নিরীক্ষণ করব। জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে প্রায় গোটা সময়টা

শব্দার্থ ও টীকা

ধরেই এই দুটি প্রশ্নের উত্তর ছিল অতি সরল— আলো দেখা হবে, দেখা হবে খালি চোখে। সেই দেখার ফল তারপর লিখে রাখা হবে খাতায়।

এই অবস্থার প্রথম বড়ো বদল ঘটল সপ্তদশ শতকের গোড়ায়। খেলনাওয়ালাদের কাছে একটি দূরবিন দেখে ইতালীয় বিজ্ঞানী গালিলিয় গালিলেই বুঝতে পারলেন, জ্যোতির্বিদ্যার কাজে এটিকে যদি যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে আকাশের জ্যোতিষ্কদের সম্পর্কে এমন অনেক তথ্য জানা যাবে যা খালি চোখে দেখে জানতে পারা সম্ভব নয়। নিজেই এ-কাজে উদ্যোগী হলেন তিনি, ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে চাঁদের দিকে দূরবিন তাক করে দেখতে পেলেন চাঁদের পাহাড় চাঁদের খাদ। বৃহস্পতির যে উপগ্রহ রয়েছে সে-কথাও জানতে পারলেন।

গালিলিয় ঠিক যে-ভাবে দূরবিন বানিয়েছিলেন সেই নকশা অবশ্য চালু রইল না খুব বেশি দিন। গালিলিয়র সমসাময়িক কালেই আর এক বিখ্যাত জ্যেতির্বিদ ইয়োহানেস কেপলার আর-একভাবে দূরবিন বানানোর প্রস্তাব দিলেন, তাতে সুবিধে আরও বেশি। অষ্টাদশ শতাব্দে আইজ্যাক নিউটন বললেন, এমন দূরবিনও বানানো সম্ভব যার মূল উপাদান হবে একটি বড়ো অবতল আয়না— মানে যে-আয়নার মাঝখানটা নীচু। তখন থেকে এখন পর্যন্ত গবেষণার কাজে যে-সমস্ত দূরবিন ব্যবহৃত হয়েছে, তার প্রায় সবই এইভাবে বানানো।

দূরবিনের নকশা যতই বদলাক, মাপ যতই বড়ো হোক, একটা ব্যাপারে গালিলিয়র আমল থেকে আর কোনো বদল হয়নি। জ্যোতির্বিদ্যায় নিরীক্ষণের ব্যাপারে যে দুটি মূল প্রশ্ন আগে তোলা হয়েছিল— কী নিরীক্ষণ করা হবে, কীভাবে করা হবে, তাদের একটির উত্তর বদলে গেল পাকাপাকিভাবে। গালিলিয়র আমলের পরেও বহুদিন তথ্য পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম ছিল আলো, কিন্তু সে-আলো দেখার কাজে খালি চোখের ব্যবহার আর কোনো দিনই হয়নি।”

— পলাশবরণ পাল: ‘বিজ্ঞান: ব্যক্তি যুক্তি সময় সমাজ’।

শব্দার্থ ও টীকা

৪

বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

8.1 প্রস্তাবনা

বাল্যকালে আপনারা এমন অনেক গল্প পড়েছেন যেখানে জীবজন্তুদের কাণ্ডকারখানা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সদুপদেশ দেওয়া হয়েছে। আবার গল্প হিসেবেও এগুলি চমৎকার। সেখানে জন্তুরা যেমন নিজেদের মধ্যে তেমনি মানুষের সঙ্গে কথা বলে। পঞ্চতন্ত্রে এমন অনেক সুন্দর সুন্দর উপদেশমূলক গল্প আছে। আধুনিক কালে বঙ্কিমচন্দ্র গল্পের এই আদলটি গ্রহণ করেছেন তাঁর ''কমলাকান্তের দপ্তর''-এর ''বিড়াল'' গল্পটিতে। এখানে কমলাকান্তের সঙ্গে বিড়ালের কথোপকথন চলেছে। বিড়াল বর্তমান সমাজ সম্পর্কে গুরুতর সব অভিযোগ তুলেছে।

আসলে বিড়াল বঙ্কিমচন্দ্রের মনের কথাগুলিই বলেছে। বঙ্কিমের দুঃখ-যন্ত্রণা, সমালোচনা, অভিযোগ বিড়ালের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। বিড়াল বঙ্কিমচন্দ্রেরই ছদ্মবেশ। দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য বিড়াল যে উপদেশগুলি দিয়েছে তা বঙ্কিমচন্দ্রেরই উপদেশ।

গল্পে কমলাকান্তের সঙ্গে বিড়ালের কথাবার্তা হচ্ছে। কমলাকান্ত যেন বিড়ালের প্রতিপক্ষ। সে ঠিক সুস্থ স্বাভাবিক লোক নয়। অল্প বিস্তর আফিম সে খায়। তার চালচুলো নেই, নসিবাবুর বৈঠকখানায় থাকে। লোকে তাকে পাগলা বলে। আফিমের নেশার ঝোঁকে সে আধা বাস্তব আধা স্বপ্নকল্পনায় বিচরণ করে। এমন একজন লোক ছাড়া বিড়ালের সঙ্গে কথাবার্তা কী করে সম্ভব হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল ঔপন্যাসিক ছিলেন না, তিনি একজন চিন্তাবিদও ছিলেন। প্রচুর প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন। কিন্তু সেখানে তো যুক্তি তথ্য সাজিয়ে লেখা। আর কমলাকান্তের দপ্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মনের দরজা হাট করে খুলে ধরেছেন। হাস্য পরিহাস, ঠাট্টাতামাসার আবরণে সমাজের ক্ষতগুলিকে ব্যঙ্গবিদ্রুপে বিদ্ধ করেছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর' ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ।

কমলাকান্ত চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। ১৮৭৫ সালে কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। তার কুড়ি বছর আগে ইংরেজি সাহিত্য ডি. কুইনসি লেখেন 'The Confession of an English Opium Eater'। কিন্তু এক আফিম খাওয়া বাদে কমলাকান্তের সঙ্গে তার কোনো মিলই নেই।

শব্দার্থ ও টীকা

8.2 উদ্দেশ্য

এই রচনাটি পাঠ করে আপনারা —

- বুঝতে পারবেন যে, আমাদের সমাজ দরিদ্র ও ধনীতে বিভক্ত। ধনীরা ক্রমাগত ধনসম্পদ বাড়িয়ে চলে আর গরিবেরা অনাহারে থাকে;
- দরিদ্রদের দুঃখ-দৈন্য উপলব্ধি করতে পারবেন;
- দরিদ্রদের শোষণ করেই যে ধনীরা বড়লোক হয় তা বুঝতে পারবেন;
- মানুষ যে অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে তার কারণ যে তাদের দারিদ্র্য তাও বুঝতে পারবেন;
- সমাজের উন্নতি হলেই যে দারিদ্র্য ঘুচে যায় না — সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবেন;
- এই চমৎকার গল্পটি পাঠ করে আনন্দলাভ করতে পারবেন। একটি গুরুতর বিষয়কে হাসি তামাসার মধ্য দিয়ে কী করে মানুষের মনে এঁকে দিতে পারা যায় তাও উপলব্ধি করতে পারবেন।

8.3 মূল পাঠ

বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

8.3.1

(1)

আমি শয়নগৃহে, চারপাই'র উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট মিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে — দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই — এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কিনা। এমন সময় একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, ''ম্যাও!''

চাহিয়া দেখিলাম — হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে যথেচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভালো নহে। ডিউক বলিল, ''ম্যাও!''

তখন চক্ষু চাহিয়া ভালো করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জারসুন্দরী, নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, ''ম্যাও!'' বলিতে পারি না, বুঝি তাহার ভিতরে একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি মার্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, ''কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।'' বুঝি, সে ''ম্যাও!'' শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি, বিড়ালের মনের ভাব, ''তোমার দুধ তো খাইয়া বসিয়া আছি — এখন বল কী?''

চারপাই = চারটি পায়াওয়ালা খাট, খাটিয়া।
প্রেতবৎ = প্রেতের মতো।
নিমীলিতলোচনে = চোখ বুঁজে।
নেপোলিয়ন = ফরাসি দেশের বিশ্ববিখ্যাত যোদ্ধা।
ওয়াটার্লু = বেলজিয়ামের একটি স্থান।
ওয়েলিংটন = ডিউক অফ ওয়েলিংটন - ইংল্যান্ডের প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ।
ডিউক = (পূর্বোক্ত)
অপরিমিত = খুব বেশি।
মার্জার = বিড়াল।
নির্জল দুগ্ধ = জল না মেশানো দুধ।

বলি কী? আমি তো ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। না জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া একটু সরিয়া বসিল। বলিল, ''ম্যাও!'' প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

8.3.2

(2)

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, ''মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখো দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কী? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে — আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ করো। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এতদিন এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

''দেখো, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম কী? পরোপকারই পরম ধর্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল — অতএব তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী, — আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা করো। আমি তোমার ধর্মের সহায়।

''দেখো আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখো, যাঁহারা বড়ো বড়ো সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে — চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

''দেখো, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে ম্যাও ম্যাও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নর্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কী প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের

শব্দার্থ ও টীকা

উদরসর্বস্ব = পেটুকেরা।
ব্যূহ = সৈন্য সাজানো।
চিরাগত = বহুদিন ধরে চলে আসা।
অবমাননা = অপমান।
মনুষ্যকুল = মানুষজাতি।
কুলাঙ্গার = বংশের কলঙ্ক।
স্বজাতিমণ্ডলে = নিজের জাতের মধ্যে।
বিধেয় = উচিত।
সকাতর চিত্তে = দুঃখিত মনে।
যষ্ঠি = লাঠি।
ধাবমান = তাড়া (করা)।
দিব্যকর্ণ = ভগবানের দেওয়া শোনার ক্ষমতা।

ক্ষুৎপিপাসা = ক্ষুধাতৃষ্ণা।
শাস্ত্রানুসারে = নীতি মেনে।
ঠেঙা = লাঠি।
আইস = এসো।
বিজ্ঞ = জ্ঞানী।
চতুষ্পদ = পশু
জ্ঞানোন্নতি = জ্ঞানের উন্নতি।
উপায়ান্তর = অন্য উপায়।
আহরিত = সংগৃহীত।
সিদ্ধ = পূরণ।
ধর্মসঞ্চয় = ধর্মলাভ।
মূলীভূত = আসল।
সাধ = ইচ্ছা।
প্রয়োজনাতীত = প্রয়োজনের অতিরিক্ত।
তদপেক্ষা = তার চেয়ে।
দণ্ড = শাস্তি।

কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মতো দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই, যে কখনও অন্ধকে মুষ্টিভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড়ো রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না — সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটোলোকের দুঃখে কাতর! ছিঃ! কে হইবে?

''দেখো, যদি অমুক শিরোমণি, কী অমুক ন্যায়ালংকার, আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং জোড় হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড়ো মান্য লোক; পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশি? তা তো নয় — তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ — দরিদ্রের দুঃখ কেহ বোঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর — আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর — ছি! ছি!

''দেখো আমাদিগের দশা দেখো, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, ম্যাও ম্যাও করিয়া আমরা চারিদিক দৃষ্টি করিতেছি— কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল — গৃহমার্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতি ভার্যার সহোদর বা মুর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল — তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।

আর আমাদিগের দশা দেখো — আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে — জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে — অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, ''ম্যাও! ম্যাও! খাইতে পাই না —'' আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও — নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ ম্যাও ম্যাও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী; কেন না আফিমখোর; তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে খাইয়া তাহার যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন-না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।

8.3.3

আমি আর সহ্য করিতে না পরিয়া বলিলাম, ''থামো! থামো মার্জারপণ্ডিত! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।''

মার্জার বলিল, ''না হইল তো আমার কী? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধন বৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কী ক্ষতি?''

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, ''সামাজিক ধন বৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।'' বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, ''আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কী করিব?''

বিড়ালকে বুঝানো দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে

শব্দার্থ ও টীকা

অগৌরব = নিন্দা।
মুষ্টিভিক্ষা = সামান্য দান।
ফাঁপরে = বিপদে।
শিরোমণি, ন্যায়ালঙ্কার = সংস্কৃতে ও শাস্ত্রে পণ্ডিত।
মান্য = শ্রদ্ধেয়, নামী।
সোহাগের = আদরের।
ভার্যা = বউ।
শতরঞ্চ = দাবাখেলা।
আহারাভাবে = না-খেয়ে।
কৃশ = রোগা।
অস্থি = হাড়।
পরিদৃশ্যমান = দেখা যাচ্ছে।
লাঙ্গুল = লেজ।
বিনত = ঝুলে পড়া।
কৃষ্ণ = কালো।
দূরদর্শী = যিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান।

মার্জারপণ্ডিত = হে বিড়ালপণ্ডিত।
সোশিয়ালিস্টিক = সমাজতন্ত্রবাদীর মতো। সমাজতন্ত্র এক ধরনের সমাজ দর্শন। ওই দর্শনের মতে সকলেই সামাজিক সম্পদের সমান অধিকারী।
নৈয়ায়িক = ন্যায় বা তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত।
কস্মিনকালে = কোনও কালে।

না। এ মার্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, ''সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।''

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, ''চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম করো। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁর চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখো। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরামবাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠ্যাঙাইয়া মারিয়ো, আমি আপত্তি করিব না।''

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারকে বলিলাম যে, ''এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউম্যান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে — আর কিছু হউক বা না হউক, আফিমের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন করো, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিয়ো, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইয়ো না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্বার আসিয়ো, এক সরিসাভোর আফিম দিব।''

মার্জার বলিল, ''আফিমের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।''

মার্জার বিদায় লইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড়ো আনন্দ হইল।

শব্দার্থ ও টীকা

নীতিবিরুদ্ধ = অনৈতিক।
হাঁড়ি খাওয়া = হাঁড়ি থেকে চুরি করে খাওয়া।
সরিষাভোর = সরষের পরিমাণ।
স্বচ্ছন্দে = অনায়াসে।
ভাণ্ডারঘর = ভাঁড়ার ঘর।

8.4 বিষয়ের রূপরেখা

একটি বিড়ালের দুধ চুরি করে খাওয়াকে কেন্দ্র করে এই গল্পের কাহিনি। ক্ষুধার্ত বিড়ালের চুরি করে খাওয়া উচিত কী অনুচিত তাই নিয়ে বিতর্ক জমে উঠেছে। ক্রমে বিড়াল হয়ে উঠেছে দরিদ্র জনসাধারণের রূপক। এই তর্কে উঠে এসেছে আমাদের সমাজে ধনী ও দরিদ্রের জীবনযাত্রায় আসমান জমিন ফারাকের কথা। একদিকে ধনবানের ভোগসুখ, আরাম আয়েশ, ধন দৌলতের শেষ নেই; আর অন্যদিকে গরিবের দুমুঠো ভাতের জোগাড় নেই। ফলে বেঁচে থাকার জন্য তারা যদি কোনো অনৈতিক কাজেও লিপ্ত হয় তার জন্য দায়ী ধনীরাই। কারণ পাঁচশ দরিদ্রকে শোষণ করে একজন বড়লোক হয়। এই বিতর্কে সমাজের প্রকৃত উন্নতি কাকে বলে সে প্রসঙ্গও এসেছে। সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন, ধনীর ধন বৃদ্ধির পথ করে দেওয়া এবং তার ধনকে নিরাপদ রাখাকে যদি সমাজের শ্রীবৃদ্ধি বলে তবে সেই শ্রীবৃদ্ধিতে দরিদ্রের কোনো প্রয়োজন নেই। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে দরিদ্রের ক্ষোভকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা বলে থামিয়ে দেওয়া হয়, ধর্ম-কর্মে নেশাগ্রস্ত করে শান্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে ভাগ করে খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন লেখক।

শব্দার্থ ও টীকা

8.4.1

আমি শয়নগৃহে . . . . . বুঝিতে পারিলাম।।

বক্তব্যসার:

রাত্রিবেলা আলোআঁধারি পরিবেশে আফিম খেয়ে কমলাকান্ত নেশার ঝোঁকে কল্পনায় বুঁদ হয়েছিলেন। ভাবছিলেন - নেপোলিয়নের বদলে তিনি হলে ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জয় করতে পারতেন কি না। একটা বিড়ালের ডাক শুনে তিনি ভাবলেন, ইংরেজ রাজপুরুষ ওয়াটার্লু জয়ের জন্য আরও কিছু পুরস্কার চান কি না। আবার বিড়ালের ডাক শুনে তাঁর তন্দ্রা ভেঙে গেল। দেখতে পেলেন, তাঁর খাওয়ার জন্য যে দুধ গোয়ালিনি রেখে গিয়েছিল তা পান করে একটি বিড়াল তৃপ্তির ডাক ডাকছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিনি চুরির জন্য বিড়ালকে শাস্তি দেওয়া উচিত কি না ভাবতে লাগলেন। প্রথমে মনে হল — এ দুধ তো গোরুর। সুতরাং এ দুধের মালিক তিনি হন কী করে? বিড়ালকেই বা চোর বলা যাবে কী করে। আর চোর বলে তাকে শাস্তি বা দেওয়া হবে কেন? কিন্তু সমাজে চিরকেলে প্রথা হচ্ছে চোরকে শাস্তি দেওয়া। চোর কেন চুরি করছে, তার পেছনে সত্যি কোনো কারণ আছে কি না কিংবা চুরির জন্য সমাজের ব্যবস্থা দায়ী কি না তা বিচারে বিবেচনা করা হয় না। কমলাকান্তের মন যেহেতু এই সব দ্বিধায় দুর্বল হল তাই মারা আর হয়ে উঠল না। এবার কমলাকান্ত অলৌকিকভাবে বিড়ালের বক্তব্য যেন শুনতে ও বুঝতে পারলেন।

বুঁদ = বিভোর।

মন্তব্য:

"আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম . . . . . ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কিনা" — ফরাসী দেশের বিশ্ববিখ্যাত যোদ্ধা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বহু যুদ্ধ জয় করেন। ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চল তিনি দখল করেন। কিন্তু বেলজিয়ামের ওয়াটার্লু নামক স্থানে ১৮২৫ সালে তিনি পরাস্ত হন ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অফ ওয়েলিংটনের কাছে এবং রাজ্য হারান। এখানে লক্ষ করার বিষয় এই যে, ভারতে ইংরেজ সরকারের উচ্চপদে চাকরি করেও তিনি ইংরেজদের পরাজিত করার কৌশল চিন্তা করছেন। যদিও আধ-পাগলা আফিম নেশাগ্রস্ত কমলাকান্তের মুখ দিয়ে কথা বলান হয়েছে তবু এর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমের মনোভাব বোঝা যায়। পরে 'আনন্দমঠ' উপন্যাস, 'বন্দেমাতরম্' গানের মধ্য দিয়ে তা সরাসরি প্রকাশিত হয়েছে।

"ওয়েলিংটন বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আফিম ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে।" "ডিউক মহাশয়কে যথেচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে।" "অপরিমিত লোভ ভালো নহে।"

উপরের বাক্যগুলিতে ওয়াটার্লু জয়ী ডিউক অফ ওয়েলিংটনের কথা বলা হয়েছে। ১৮২৮ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন; পরে পার্লামেন্টের সভ্যও ছিলেন। এখানে তাঁকে বিড়াল এবং নেশাখোর ভিক্ষুক বানানো হয়েছে। প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে অপরিমিত লোভী বলা হয়েছে। ইংরেজদের পররাজ্য অধিকারের লোভকে এখানে ব্যঙ্গ ও নিন্দা করা হয়েছে।

পার্লামেন্ট (Parliament) = সংসদ
অপরিমিত = অঢেল

"কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই" — একটা প্রবাদ। অর্থ হচ্ছে — যারা কষ্ট করে কোনো একটা জিনিস তৈরি করে তারা তা ভোগ করার সুযোগ পায় না। লেখক অন্য জায়গায় বলেছেন — চাষি বহু কষ্ট করে ফসল ফলায়, কিন্তু সে অনাহারে দিন কাটায়। জমিদার মহাজন সব আত্মসাৎ করে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 8.1

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ—

1. ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন _____।

ক. আলেকজান্ডার

খ. নেপোলিয়ন

গ. ক্রমওয়েল

2. ডিউক অফ _____কে কমলাকান্তের অপরিমিত লোভী মনে হয়েছিল।

ক. ওয়েলিংটন

খ. ক্যান্টারবেরি

গ. বার্মিংহাম

3. দুধ দিয়ে গিয়েছিল _____ গোয়ালিনি।

ক. প্রজা

খ. দুখি

গ. প্রসন্ন

সঠিক কথাটি চিহ্নিত করুন —

4. কমলাকান্ত বিড়ালকে মারতে পারেননি, কারণ —

ক. লাঠিখানা ভাঙা ছিল

খ. তাঁর শরীর দুর্বল ছিল

গ. বিড়ালের কথা বুঝতে পারলেন।

5. যারা কষ্ট করে মাছ ধরে, তারা মাছ খেতে পায় না, কারণ —

ক. বিড়ালে মাছ খেয়ে যায়

খ. মালিক মহাজন মাছ নিয়ে যায়

গ. মাছ খেতে তারা ভালবাসে না।

অনধিক চারটি বাক্যে উত্তর লিখুন —

6. কমলাকান্ত নেশার মৌজে কী কী কল্পনা করেছিলেন?

7. কমলাকান্তের কল্পনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির কী পরিচয় পান?

8. বিড়ালকে চোর বলতে কমলাকান্তের দ্বিধার কারণ কী?

8.4.2

বুঝিলাম যে বিড়াল বলিতেছে . . . . . পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।

বক্তব্যসার:

কমলাকান্ত এবং বিড়ালের কথোপকথন। বিড়াল তার দুধ চুরি যে অন্যায় নয় তা যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছে। বিড়াল এখানে দরিদ্র জনসাধারণ থেকে অভিন্ন। তার কথা সমাজের গরিব জনসাধারণের মনের কথা। বিড়াল

বলছে — গায়ের জোর না-দেখিয়ে যুক্তি বুদ্ধি নৈতিকতা দিয়ে সামাজিক অবস্থা বিচার করা উচিত। সমাজে যারা মান্যগণ্য ধনী, তারাই কেন সমস্ত ভোগবিলাস সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে আর গরিবেরা কেন না-খেয়ে শুকিয়ে মরবে। সবারই তো ক্ষুধা তৃষ্ণা সমান। ধনীরা বেশি বেশি ভোগ করুক, কিন্তু গরিবরা কেন খুদ-কুঁড়োও পাবে না। কেন তারা কেবল মার খেয়েই যাবে।

এরপর প্রকৃত ধর্ম কাকে বলে বিড়াল তা ব্যাখ্যা করেছে। পরের উপকার করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। দুধ চুরি করে খেয়ে বিড়াল প্রকৃতপক্ষে কমলাকান্তকে ধর্মকর্ম করায় সাহায্য করেছে। ধনীরা দরিদ্রকে বিন্দুমাত্র সাহায্য না-করে নিজেদের সাধুপুরুষ বলেন। এঁরা সবচেয়ে বড়ো অধার্মিক। এঁরা দরিদ্রদের অসামাজিক কাজ করতে বাধ্য করেন। সমাজের অসামাজিক কাজের জন্য দায়ী এই অভিজাত ধনীরা। এরা রাজা মহারাজাদের তুষ্ট করতে ব্যগ্র। ধর্মব্যবসায়ীদের তোয়াজ করতে এক-পায়ে খাড়া। মোসাহেবদের পোষেন; পরগাছা শ্রেণির এই লোকদের পোষা-বিড়াল বলা হয়েছে।

বিড়াল এখানে দরিদ্র অনুন্নত শ্রেণির লোকদের করুণ অবস্থার এক **মর্মন্তুদ** বিবরণ দিয়েছে। খেতে না পেয়ে তাদের শরীর শুকিয়ে গেছে, পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে। তারা কথা বলার শক্তি হারিয়েছে। ধনীর ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্টও তারা পায় না। বিড়াল বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করেছে — যতদিন এই অবস্থা থাকবে ততদিন বাঁচার জন্য গরিবেরা যদি সমাজবিরোধী কাজ করে তবে তাতে কোনো অন্যায় নেই। দারিদ্র্যের কারণ ব্যাখ্যা করে সে বলেছে — বহু মানুষকে শোষণ করে এক-একজন ধনী হয়ে ওঠে।

শব্দার্থ ও টীকা

সাধুপুরুষ = ধার্মিক ব্যক্তি।

মর্মন্তুদ = করুণ।

মন্তব্য:

''তোমাদের বিদ্যালয় সকল . . . . . এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।'' — বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এই শিক্ষাব্যবস্থা ধনীর পক্ষপাতী, দুর্বলদের প্রতি উদাসীন। প্রকৃত ধর্ম কাকে বলে তাও এই ব্যবস্থা শেখায় না।

শয্যাশায়ী মানুষ — কোনো কাজ না করে আরামে থাকে যে মানুষ; পরগাছা লোক।

ছোটোলোক — এখানে অর্থ - গরিব মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র লিখেছেন — ''মনুষ্যালয়ে বড় মানুষ বলিলে . . . আট হাত বা দশ হাত মানুষ বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবী (মুদ্রা) বাস করেন, তাহাকেই ''বড় মানুষ'' বলে। যাহার ঘরে এই দেবী (মুদ্রা) স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও তাহাকে ''ছোট লোক'' বলে।''

যদি অমুক শিরোমণি, কী অমুক ন্যায়ালঙ্কার — সংস্কৃত ধর্মব্যবসায়ী বা পণ্ডিত, পুরোহিতদের প্রতি বঙ্কিমের বিতৃষ্ণা এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

তেলা মাথায় তেল দেওয়া — যাদের অনেক আছে তাদের আরও পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করা। একটি প্রবাদ।

আমাদের দশা — দরিদ্রের অবস্থা, দুঃখ দুর্দশা বর্ণনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। হাসিতামাসা ব্যঙ্গবিদ্রুপ থেকে এখানে তিনি দুঃখ বেদনা যন্ত্রণায় ডুবে গেছেন। ক্ষুধার নিদারুণ ছবি তুলে ধরেছেন।

আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না — এখানে কেবল দেশীয় ধনীদের প্রতি কটাক্ষ করেননি বঙ্কিমচন্দ্র, শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ শাসকদের দরিদ্র ভারতবাসীদের প্রতি অত্যাচার উপেক্ষাকেও ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

সোহাগের বিড়াল — আদরের পোষা বিড়াল।

একটি সমাজচিত্র — ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা কমলাকান্তের দপ্তরের 'বিড়াল'। অধিকাংশ মানুষ তখন দরিদ্র, ক্ষুধায় জর্জরিত; অন্যদিকে কিছু ধনী, বড়লোক। দরিদ্রের প্রতি ছিটেফোঁটা সহানুভূতি নেই, সামান্য সাহায্যও করে না তাদের। ওদের আরাম, আয়েস, খানাপিনার শেষ নেই। অপচয় অপব্যয় করে, তবু দরিদ্রকে কানাকড়িও দেয় না। রাজামহারাজাদের তোষামোদ করে। ধর্মব্যবসায়ী সমাজপতিদের তোয়াজ করে। মোসাহেব পোষে। মূর্খ ধনীরা সভাকবি রাখে, তাদের গুণগান শোনার জন্য। একাধিক বিবাহ করে। বুড়ো বয়সে অল্পবয়স্ক মেয়েদের বিয়ে করে। তাসপাশা খেলে সময় কাটায়।

পাঠগত প্রশ্ন : 8.2

শূন্যস্থানে সঠিক কথাটি বসান —

1. শ্রেষ্ঠ ধর্মকর্ম হচ্ছে ____________।

ক. তীর্থভ্রমণ করা

খ. পূজাআর্চা করা

গ. পরোপকার করা

2. চুরির মূলে আছে ____________।

ক. ধনীর কার্পণ্য,

খ. গৃহস্থের অসাবধানতা

গ. অসামাজিক প্রবণতা

3. পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ভোগ্যবস্তুতে অধিকার আছে কেবল ____________।

ক. ধনীদের

খ. দরিদ্রদের

গ. ধনী দরিদ্র সবার

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ—

4. বিড়াল বলছে, মানুষের জ্ঞানোন্নতির জন্য বিজ্ঞ ____________ কাছে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন।

5. শ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে ____________।

6. ধনীর দোষেই ____________ চোর হয়।

উত্তর সংক্ষেপে লিখুন —

7. ''তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে — আমাদের কী নাই'' — কে কাদের কেন এই প্রশ্ন করেছিল?

8. ''আমাকে প্রহার না করিয়া আমার প্রশংসা করো।'' — প্রহার না করে প্রশংসা করার পিছনে বিড়ালের যুক্তি কী?

9. ''ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়'' — বিড়াল এমন কথা বলছে কেন?

10. ''ছোট লোকের দুঃখে কাতর! ছিঃ! কে হইবে?'' — উক্তিটি কে কোন অর্থে বলেছে?

শব্দার্থ ও টীকা
কদাচার = কুৎসিত আচরণ।

8.4.3

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া . . . . . বড়ো আনন্দ হইল।

বক্তব্যসার:

এতক্ষণ বিড়াল ধনীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার, অধর্ম, অনাচার-কদাচারের অভিযোগ সরাসরি ব্যক্ত করছিল। অত্যাচারিত দরিদ্রদের দুঃসহ দুরবস্থার ছবি তুলে ধরছিল। এবার শুরু হল কমলাকান্তের সঙ্গে বিড়ালের সওয়াল জবাব। কমলাকান্ত ধনীদের পক্ষের যুক্তিগুলি হাজির করছেন, এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও শ্লেষের ছুরিতে তার অন্তঃসার শূন্যতাকে প্রকাশ করে দিচ্ছেন।

কমলাকান্তের বক্তব্য — বিড়ালের কথাগুলি সমাজতন্ত্রীদের কথা। এই বক্তব্য সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। যাদের ক্ষমতা আছে তারা ধনসম্পদ বাড়িয়েই চলবে। তাতে বাধা দিলে সমাজের উন্নতি হবে না। সমাজের উন্নতি মানে ধনীর ধন বৃদ্ধি। বিড়ালের বক্তব্য — যে উন্নতিতে গরিব না-খেয়ে মরে সে উন্নতিতে গরিবের কী প্রয়োজন? কমলাকান্ত ধনীদের সমর্থন করতে গিয়ে আসল সত্যটা প্রকাশ করে দিলেন। তা হল — সমাজের উন্নতি অর্থাৎ ধনীদের উন্নতির পথে যারা বাধা সৃষ্টি করবে, এখনকার বিচারে তাদের সাজা পেতে হবে।

বিড়াল এবার বিচারব্যবস্থার অসততাকে তুলে ধরল। সে বলল — ক্ষুধার্তের চুরি করার প্রকৃত বিচার করতে হলে বিচারককে অনাহারে থেকে ক্ষুধার জ্বালা বুঝতে হবে। তবেই হবে সত্য বিচার।

তর্কে না পেরে উঠে কমলাকান্ত বিড়ালকে উপদেশ দিলেন যে এই সব সমাজ-ভাঙার কথা বলা উচিত নয়। বরং ধর্মের আফিম খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা ভোলাই ভাল।

কমলাকান্ত শেষ পর্যন্ত চুরির অভিযোগ প্রত্যাহার করে বিড়ালের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কমলাকান্ত এই কাহিনির শেষ বাক্যে এক কঠোর ব্যঙ্গে বর্তমান সমাজের ভণ্ডামিকে নগ্ন করে খুলে ধরলেন। এরা মনে করে — যারা নিষ্ঠুর সত্যকে প্রকাশ করে তারা সমাজবিরোধী, আর যারা বাস্তবকে আড়াল করতে চায় তারাই মহাজ্ঞানী। কমলাকান্ত প্রশংসার ছলে তীব্র ধিক্কার ছুঁড়ে দিলেন।

মন্তব্য:

তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক। সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল।

সোশিয়ালিস্টিক — সমাজতন্ত্রবাদী। তারা চায় ধনের সমান বন্টন। সমাজে যে যেমন শ্রম দেবে সে তেমনি তার পুরো দাম পাবে। জমিজমা কলকারখানার মালিক হবে রাষ্ট্র।

মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সমাজতন্ত্রীদের কথা ঠিক বলে মনে করতেন।

যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না — বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ছিলেন হাকিম, দেশের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অনাস্থা এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউম্যান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি।

ক্ষুধার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা বন্ধ করার সবচেয়ে বড়ো দাওয়াই ধর্মকর্মে মন দেওয়া।

জন হেনরি নিউম্যান (১৮০১-৯০) একজন বিখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক ও পাদ্রী। ধর্ম সাহিত্য রচনার জন্য তিনি বিখ্যাত।

পাঠগত প্রশ্ন : 8.3

শূন্যস্থানে সঠিক কথা বসান —

1. কমলাকান্তের মতে সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ____________ ধনবৃদ্ধি।

ক. গরিবের

খ. ধনীর

গ. গরিব ও ধনীর

2. কমলাকান্ত মনে করে বিড়ালের না বোঝার অধিকার আছে; কারণ সে ____________।

ক. মূর্খ

খ. দরিদ্র

গ. সুবিচারক

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠার্থে = পড়ার জন্য।

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন —

3. সমাজের প্রয়োজনে চোরকে ____________ দেওয়া উচিত।

4. ক্ষুধার জ্বালা ভোলার জন্য ____________ পাঠ করা উচিত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন —

5. কমলাকান্তের মতে সমাজের উন্নতির পন্থা কী?

6. সমাজের ধনবৃদ্ধির ব্যাপারে বিড়াল উদাসীন কেন?

7. সুষ্ঠু বিচারের জন্য সুবিচারকের কী করা কর্তব্য?

8. দুধ চুরির সমস্যার সমাধানের জন্য কমলাকান্ত শেষ পর্যন্ত কোন প্রস্তাব দিয়েছিল?

8.5 আপনি যা শিখলেন

1. একটি হাস্য-পরিহাসের মজার গল্পের মধ্য দিয়ে কী করে সমাজের ভেতরের গুরুতর গলদকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায় তা বুঝলেন।
2. দুটি রূপক চরিত্রের কথাবার্তা তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের ধনী ও দরিদ্রের জীবনযাত্রার আকাশ-পাতাল ফারাকের কথা বুঝতে পারলেন।
3. বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কালে ধনবানদের কদর্য জীবনযাত্রার ছবিটা দেখতে পেলেন।
4. সোজাসাপটা বলার থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে বললে সমালোচনা যে অনেক বেশি ধারালো হয় তা বুঝতে পারলেন।
5. বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কার শিক্ষাব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জানতে পারলেন।
6. ইংরেজ শাসকদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ মনোভাব বুঝতে পারলেন।
7. অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের চিন্তার ত্রুটি কোথায় তা জানতে পারলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

8.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

অনধিক দশটি বাক্যে উত্তর লিখুন —

1. 'বিড়াল' গল্পে দরিদ্রদের যে মর্মন্তুদ অবস্থা ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করুন।

2. 'বিড়াল' গল্পে ধনবানদের জীবনযাত্রার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা সংক্ষেপে লিখুন।

3. 'বিড়াল' গল্পে কাদের 'পতিত আত্মা' বলা হয়েছে? কোন অর্থে তা বলা হয়েছে? কাদের কাছে কেন তারা পণ্ডিত?

4. ''থামো! থামো . . . তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক'' — বিড়ালের কথাগুলিকে সোশিয়ালিস্টিক বলার কারণ কী? তাকে থামিয়ে দেওয়ারই বা কারণ কী?

5. 'বিড়াল' গল্পে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের কোন্ ধাঁচ গ্রহণ করেছেন? কেন করেছেন?

6. দরিদ্রদের সঙ্গে ধর্মাচরণের কেমন সম্পর্কের কথা 'বিড়াল' গল্পে বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।

7. গল্পে ব্যবহার করা হয়েছে এমন দুটি প্রবাদ ও তার অর্থ লিখুন।

8.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

8.1

1. (খ)

2. (ক)

3. (গ)

4. (গ)

5. (খ)

6. কমলাকান্ত ওয়াটার্লুর যুদ্ধ, নেপোলিয়ন, ডিউক অফ ওয়েলিংটন সম্পর্কে কল্পনা করছিলেন।

7. ইংরেজ বিরোধী মনোভাবের পরিচয়।

8. চুরি সম্পর্কে কমলাকান্তের প্রশংসা।

8.2

1. (গ)

2. (ক)

3. (গ)

4. চতুষ্পদের

শব্দার্থ ও টীকা

5. পরোপকার

6. গরিবেরা

7. ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রাণীমাত্রেরই থাকা সত্ত্বেও দরিদ্ররা খেতে পায় না।

8. বিড়াল চুরি করে কমলাকান্তের পরোপকারে সাহায্য করেছে।

9. ধনীরা দরিদ্রদের কিছু দেয় না বলেই তারা চুরি করতে বাধ্য হয়।

10. ধনীর বিবেকহীনতাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে।

8.3

1. (খ)

2. (গ)

3. শাস্তি

4. ধর্মগ্রন্থ

5. ধনীর ধনবৃদ্ধি ও ধনরক্ষাতেই সমাজের উন্নতি।

6. যে উন্নতিকে গরিবের কোনও সুরাহা হয় না, তাতে বিড়ালের কিছু এসে যায় না।

7. অপরাধীর অপরাধের কারণ উপলব্ধি করা।

8. ভাগ করে খাওয়ার প্রস্তাব।

8.7 লেখক পরিচিতি

বাংলা ভাষার প্রথম ও সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ভাষাকে সুন্দর ও মধুর করে গড়ে তুলেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য সৃষ্টির পথ প্রস্তুত করে দিয়েছেন তিনি। কেবল উপন্যাস নয়, নানা সমস্যা, চিন্তা ও ভাব নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনা তাঁর এক অক্ষয় কীর্তি। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক। পেশায় ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বাংলার বিভিন্ন জেলায় তিনি দীর্ঘদিন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর তার মধ্যেই রচনা করে গেছেন ১৪ খানি উপন্যাস ও বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক। নির্ভীক এই উচ্চ পদাধিকারী ও সাহিত্যিক নীলকর সাহেবদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের যেমন রক্ষা করেছেন তেমনি নানা বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করতেও পিছপা হননি।

তার জন্ম ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জুন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায়। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। মায়ের নাম দুর্গাসুন্দরী। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল।

তাঁর রচিত কয়েকখানি উপন্যাস — দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ইত্যাদি। 'বন্দেমাতরম্' সংগীতটি তাঁরই রচনা।

শব্দার্থ ও টীকা

8.8 সমধর্মী রচনা

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর বিভিন্ন প্রবন্ধ।

'কমলাকান্তের পত্র'

'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'

'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত'

'বঙ্গদেশের কৃষক'

শব্দার্থ ও টীকা

9

শিলাইদহ থেকে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

9.1 প্রস্তাবনা

এটি একটি চিঠির অংশবিশেষ। চিঠিও যে সাহিত্য গুণান্বিত হয়ে উঠতে পারে এটি তার অতি সুন্দর নিদর্শন।

গুণান্বিত = গুণসম্পন্ন।

রবীন্দ্রনাথ অধুনা বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়া জেলার শিলাইদহে জমিদারি পরিদর্শনের কাজে থাকার সময় এই চিঠি লিখেছিলেন তাঁর প্রিয় ভাইঝি (মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ আর মেজবউদি জ্ঞানদানন্দিনীর কন্যা) বছর কুড়ির ইন্দিরা দেবীকে।

ওই সময় তিনি বাংলার পল্লিজীবনকে খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। তার ফলে পল্লিবাংলার প্রকৃতি আর মানুষকে তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মন দিয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগও ঘটেছিল।

এই পত্রে মেঘলা দিনের একটি অনুপম চিত্র আঁকার পাশাপাশি কবি তাঁর হতদরিদ্র প্রজাদের অসহনীয় দুর্দশার বর্ণনা দিয়েছেন। আর সেই প্রসঙ্গে এসেছে মানুষের দুঃখমোচন আর দারিদ্র্য দূর করা নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা। সমাজবাদীরা যে গোটা পৃথিবীতে সব মানুষের মধ্যে বিত্তের সমবণ্টনের কথা বলে থাকেন তার প্রতি কবির আস্থাও প্রকাশিত হয়েছে। এর অনেক পরে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলেন তখন তিনি একই রকম কথা বলেছেন।

অনুপম = অতুলনীয়।

যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রখানি লিখেছেন তাঁর তখনকার আর সমস্ত গদ্যরচনা সাধুভাষায় লেখা, কিন্তু চিঠিতে তিনি সহজ ও সরল চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন।

এই পাঠটি রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। এটি ৯৫ সংখ্যক পত্র।

9.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- পল্লিবাংলার বিশিষ্ট রূপ ও প্রকৃতির কথা;

শব্দার্থ ও টীকা

- গ্রামীণ মানুষের অসহায়তার কথা;
- সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে আশার আলোর সম্ভাবনা;
- অন্তরঙ্গ জনকে লেখা চিঠিও সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে।

9.3 মূল পাঠ

(1)

শিলাইদহ
১০ মে ১৮৯৩

ইতিমধ্যে দেখছি খুব ফুলো ফুলো বড়ো বড়ো কতকগুলো মেঘ চতুর্দিক থেকে জমে এসেছে— আর এই চারি দিকের দৃশ্যপট থেকে কাঁচা সোনালি রোদ্দুরটুকু যেন মোটা মোটা ব্লটিংপ্যাড দিয়ে একেবারে চুপসে তুলে নিয়েছে। আবার যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তা হলে ধিক্ ইন্দ্রদেবকে। মেঘগুলোর তেমন ফাঁকা দরিদ্র চেহারা দেখছিলেন, বাবুদের মতো দিব্যি সজলশ্যামল টেবোটোবো নধরনন্দন ভাব। এখনই বৃষ্টি আরম্ভ হল ব'লে— হাওয়াটা সেইরকম কাঁদো কাঁদো ভিজে ভিজে ঠেকছে। এখানে এই মেঘ-রৌদ্রের যাওয়া-আসা ব্যাপারটা যে কতটা গুরুতর, আকাশের দিকে যে কত লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে, শিমলার সেই অভ্রভেদী পর্বতশৃঙ্গে বসে তা ঠিকটি কল্পনা করা শক্ত হবে।

ব্লটিং প্যাড = চোষ কাগজ।
অভ্রভেদী = আকাশ-ছোঁয়া, সুউচ্চ।
পর্বতশৃঙ্গ = পাহাড়ের চুড়ো।
সজলশ্যামল = জল-ভরা কালো রঙের।
টেবোটোবো = নাদুসনুদুস গোলগাল।

শব্দার্থ টীকা :

নধরনন্দন = সুপুষ্ট ও দেখতে ভালো।
পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় = দারুণ সূর্যতাপে কিংবা খরার দরুন জমিতে সরসতার অভাব ঘটার ফলে ফসল না-জন্মানোর অবস্থা।

(2)

আমার এই দরিদ্র চাষি প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায়, তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে— কোনোমতে একটুখানি ক্ষুধা ভাঙলেই আবার তখনই সমস্ত ভুলে যায়।

(3)

সোশিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধনবিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানিনে— যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য। কেননা পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্য মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে, কোনোকালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের মূল আবশ্যক জিনিসও বন্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনামাত্র, কখনই সকল মানুষ খেতে-পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই,

সোশিয়ালিস্ট = একদল দার্শনিক যাদের মতবাদ হল : সামাজিক ভোগ্যবস্তুতে সমাজের সকলেরই সমান অধিকার।

শব্দার্থ ও টীকা

এর কোনো পথ নেই, তারা ভারী কঠিন কথা বলে। কিন্তু এ-সমস্ত সামাজিক সমস্যা এমন কঠিন! বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর এক দিক ঢাকতে গিয়ে আর-এক দিক বেরিয়ে পড়ে— দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায়, এবং ধন গেলে সমাজের কত যে শ্রীসৌন্দর্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই। কিন্তু আবার এক-একবার রোদ্দুর উঠছে— পশ্চিমে মেঘও যথেষ্ট জমে আছে।

9.4 বিষয়ের রূপরেখা

9.4.1 বক্তব্যসার:

আকাশ-জুড়ে প্রচুর কালো মেঘ জড়ো হয়েছে। মেঘের দাপটে চারপাশ থেকে সকালের রোদটুকু উধাও। জমাটবাঁধা মেঘের আয়োজন আর বাতাসের জোলো ভাব থেকে বোধ হচ্ছে এখনই বৃষ্টি নামল বলে।

মন্তব্য :

চিঠিলেখার তারিখ মে মাসের। গ্রীষ্মঋতু হলেও আগের দিন জোর বৃষ্টি হয়েছে। এদিন সকালেও আবার বর্ষণের তোড়জোড় চলছে। পত্রলেখক তাই মেঘের দেবতার এ হেন আচরণে অপ্রসন্ন হয়েছেন।

এই পাঠ্যাংশে 'ফুলো ফুলো' 'বড়ো বড়ো' 'কাঁদো কাঁদো' 'ভিজে ভিজে' এমন শব্দদ্বৈত (অর্থাৎ একই শব্দকে পরপর দু-বার ব্যবহার করা) দিয়ে বহুবচনের ভাব বোঝানো হয়েছে। এই ধরণের শব্দদ্বৈতের সাহায্যে কোনো বিশেষ্যের কিছু গুণ বা প্রকৃতি বা অবস্থার কথা বলা হয়। যেমন, প্রথম বাক্যের 'বড়ো বড়ো' শব্দদ্বৈতটি মেঘ-এর প্রকৃতি নির্দেশ করছে— প্রচুর বিশাল আয়তনের মেঘ।

পাঠগত প্রশ্ন : 9.1

অনুবিভাগ - ১

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) কাঁচা (i) ..... রোদ্দুরটুকু যেন মোটা মোটা (ii) ..... দিয়ে একেবারে (iii) ..... তুলে নিয়েছে।

২) কোন জিনিসকে 'ফুলো ফুলো' 'বড়ো বড়ো' বলা হচ্ছে?

৩) বাতাসকে কেন 'কাঁদো কাঁদো ভিজে ভিজে' বলা হয়েছে?

9.4.2 আমার এই দরিদ্র . . . সমস্ত ভুলে যায়।

বক্তব্যসার:

গ্রামবাংলার চাষিরা শুধু বৃষ্টির জলের উপর ভরসা করেই ফসল ফলানোর কাজে নামে। তাই আকাশের জল আর সূর্যকিরণ যাতে ঠিকমতো পাওয়া যায় সেজন্য তারা হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে। কোনো কারণে শস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটলে কিংবা শস্যহানি হলে তাদের হা-হুতাশ করা ছাড়া গতি থাকে না। তারপর আবার

শব্দার্থ ও টীকা

যেই একটু সুরাহা হয় অমনি তারা ছেড়ে-আসা দিনগুলির করুণ অবস্থার কথা ভুলেই যায়।

মন্তব্য :

চিঠির গোড়ায় লেখক আকাশে মেঘের আনাগোনা আর জল-ভরা বাতাসের বর্ণনাটি সুন্দরভাবে দিয়েছেন। কিন্তু শুধু প্রকৃতির মধ্যেই তাঁর মন আটকে থাকেনি, এই সময়ে তাঁর গরিব প্রজাদের অবস্থা নিয়েও তিনি উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। সুউচ্চ শিমলা পাহাড়ে মা-বাবার সঙ্গে অবকাশ যাপন করছে যে পত্র-প্রাপক তাকে তিনি সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে গ্রামবাংলার প্রভূত পার্থক্যের কথা শোনাচ্ছেন। বলছেন নিম্নভূমির গরিব কৃষককুলের দুরবস্থা সেখানে বসে উপলব্ধি করা সহজ নয়। এখানকার চাষিদের শস্য ফলাবার জন্য আকাশের দয়ার উপর একান্তভাবে নির্ভর করে থাকতে হয়। উনিশ শতকের প্রায় অন্তিম লগ্নে যখন এই পত্র লেখা হচ্ছে তখন পরাধীন ভারতে ফসলখেতে সেচ বা সারের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। চাষিদের জীবনযাত্রা ছিল দুঃসহ। কিন্তু কোনোক্রমে একটুমাত্র সুখের উদয় হলেই তাদের আর আগেকার দুঃখময় অবস্থার কথা মনে থাকে না।

পাঠগত প্রশ্ন : 9.2

১) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

(ক) 'বিধাতার শিশুসন্তানের মতো' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে:
(i) শিমলার অধিবাসী, (ii) পল্লির দরিদ্র চাষি প্রজা

(খ) প্রজাদের প্রতি পত্রলেখকের মনোভাব কীরকম :
(i) তারা মায়ার পাত্র, (ii) তারা সুখী মানুষ (iii) তারা প্রীতিভাজন

২) গ্রামের দীনদুঃখী মানুষ কীভাবে দিন কাটায়?

৩) 'পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায়'— এই বাক্যবন্ধের দ্বারা লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

9.4.3 সোশিয়ালিস্টরা যে সমস্ত . . . যথেষ্ট জমে আছে।

বক্তব্যসার :

সোশিয়ালিস্ট বা সমাজতন্ত্রীরা চায় পৃথিবীজুড়ে মানুষের মধ্যে বিত্তের সমবণ্টনের ব্যবস্থা কায়েম করতে। বাস্তবে যদি সেটা কখনও না সম্ভব হয়ে ওঠে তবে তা মানবসমাজের পক্ষে বড়োই দুর্ভাগ্যের। অন্যদিকে কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন যে সারা পৃথিবীতে সবার জন্য জীবনধারণের অত্যাবশ্যক বস্তুগুলির বণ্টন নিতান্তই অসম্ভব কল্পনাবিলাস। শেষোক্ত মতানুসারে বেশিরভাগ মানুষকেই চিরকাল আধপেটাই থেকে যেতে হবে। এটা অতি ভয়াবহ কথা। আসলে, দারিদ্র্য দূরীকরণ আর সামাজিক শ্রীবৃদ্ধির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনা খুবই জরুরি। আকাশে মেঘ ছেয়ে থাকাই একমাত্র ঘটনা নয়, আবার তো ঝলমলে রোদের দেখাও মেলে।

মন্তব্য :

দরিদ্র প্রজাবর্গের নিদারুণ দুঃখজর্জর দশায় লেখক গভীরভাবে মর্মাহত। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে সর্বজনের জন্য ধনের সমবণ্টন আর সুযোগসুবিধার সমানাধিকার নিয়ে যা বলা হয়েছে তার দিকে লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি একান্তভাবে চান একদিকে দুঃসহ দারিদ্র্য আর অন্যদিকে সমাজের শ্রীসৌন্দর্য বৃদ্ধির এই বৈষম্যের

শব্দার্থ ও টীকা

অবসান। সমাজতান্ত্রিক মতবাদে লেখক আশার আলো দেখতে পান।

পাঠগত প্রশ্ন : 9.3

১) খোপের মধ্যে দেওয়া শব্দগুলি থেকে বাছাই করে নীচের শব্দগুলির বিপরীত শব্দ বসান—

(i) দুঃখ— (v) নিষ্ঠুর—

(ii) হতভাগ্য— (vi) উচিত—

(iii) আবশ্যক— (vii) ক্ষুদ্র—

(iv) উন্নতি— (viii) সীমা—

সৌভাগ্যবান, অবনতি, বৃহৎ, সুখ, অনুচিত, সদয়, অসীম, অনাবশ্যক।

২) অর্থ লিখুন —

অর্ধাশন—

বিধির বিধান—

নিরুপায়—

দৃশ্যপট—

সজলশ্যামল—

৩) দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখমোচনের কী উপায় হতে পারে বলে লেখক মনে করেন?

৪) কোন্ মতবাদকে লেখক 'ভারী কঠিন কথা' বলেছেন?

৫) 'দুঃখমোচনের জন্য মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে'— লেখকের এই বক্তব্য সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানান।

9.6 আপনি যা শিখলেন

1. বাংলার পল্লিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারা;
2. গ্রামীণ দরিদ্র জনসমাজের জীবনযাপন বিষয়ে পরিচিত হওয়া;
3. দীনদুঃখী মানুষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া;
4. মানুষের দুঃখমোচনে প্রয়াসী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা;
5. লেখার গুণে একটি চিঠিও যে সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে তা বুঝতে পারা।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠান্ত প্রশ্ন

1. বৃষ্টি আসার আগে আকাশের ভাব আর হাওয়ার অবস্থা কেমন হয় তা বর্ণনা করুন।
2. 'এখানে এই মেঘ-রৌদ্রের যাওয়া-আসা ব্যাপারটা যে কতটা গুরুতর'— এই বাক্যাংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
3. 'সোসিয়ালিস্ট'দের বক্তব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কী মতামত দিয়েছেন?

9.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

9.1

১) (i) সোনালি (ii) ব্লটিংপ্যাড (iii) চুপসে

২) আকাশের মেঘকে। বিশাল আকারে জল-ভরা মেঘের রাশি সারা আকাশকে ছেয়ে ফেলেছে।

৩) বাতাসে প্রচুর জলকণা রয়েছে।

9.2

১) (ক) (i) (খ) (i)

২) তারা খুবই গরিব। ঠিকমতো বৃষ্টি হয়ে জমি চাষের উপযোগী হলে তবে তাতে ফসল ফলিয়ে তারা কোনোমতে খেয়ে-পরে বাঁচে।

৩) জলহীন খরার অবস্থা

9.3

১) (i) সুখ, (v) সদয়, (ii) সৌভাগ্যবান, (vi) অনুচিত, (iii) অনাবশ্যক, (vii) বৃহৎ, (iv) অবনতি (viii) অসীম

২) শব্দার্থ দেখুন।

৩) এজন্য সমাজের উন্নত অংশকে অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৪) মতবাদটি হল : পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণধারণের জন্য জরুরি জিনিসগুলি ভাগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেহাতই অসম্ভব ব্যাপার।

৫) আপনার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করুন।

লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ মে ১৮৬১ — ৭ আগস্ট ১৯৪১)-এর জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মা-র নাম সারদা দেবী। বিশ্বজোড়া তাঁর স্বীকৃতি। এই জন্য তাঁকে বিশ্বকবি বলা

শব্দার্থ ও টীকা

হয়। তাঁর প্রতিভাস্পর্শে বাংলাভাষার মর্যাদা বিশেষভাবে বর্ধিত হয়েছে। ভারত আর বাংলাদেশ দুটি রাষ্ট্রেরই জাতীয় সংগীত তাঁর রচিত। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর শিক্ষাভাবনার মূল কথা হল প্রথাগত পদ্ধতির বদলে আনন্দময় পরিবেশে বিদ্যার্জনের ব্যবস্থা। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর অনন্য কীর্তি। এই প্রতিষ্ঠান পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তিনি প্রচুর কবিতা গান গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে: কাব্য— নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, কল্পনা, পূরবী, শেষ সপ্তক; উপন্যাস— গোরা, চোখের বালি, চার অধ্যায়, ঘরে বাইরে; নাটক— বিসর্জন, ডাকঘর, রাজা, রক্তকরবী, চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি।

সমধর্মী রচনা

রবীন্দ্রনাথের আর একটি চিঠি— তাঁর প্রিয় বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা—

সোলাপুর
অক্টোবর ১৮৮৫

আপনি তো সব-ডেপুটি সাহেব— বন্যার মুখে বাংলা মুল্লুকে ভেসে বেড়াচ্ছেন— আমরা কলকাতায় যাচ্ছি, সে খবর রাখেন কি? এই চিঠি এবং আমরা শুক্রবারের সকালের ডাকে কলিকাতায় বিলি হব। আমাদের প্রবাসের পালা সাঙ্গ করলুম— এখানকার অগাধ আকাশ, অবাধ বাতাস, উদার মাঠ, বিমল শান্তি, এসব পশ্চাতে রেখে সেই বাঁশতলার গলি, জোড়াসাঁকোর মোড়, সেই ছ্যাক্‌রা গাড়ির আস্তাবল, সেই ধুলো, সেই ঘড়্‌ঘড়্‌ হুড়্‌মুড়্‌ হইহই, সেই মাছি-ভন্‌ভন্‌ ময়রার দোকান, সেই ঘোরতর হিজিবিজি হ-য-ব-র-ল'র মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করতে চললুম। সেখানে তিন হাজার গির্জের চুড়ো, কলের চিমনি, জাহাজের মাস্তুল নীল আকাশে যেন গুঁতো মারতে উঠেছে; কলকাতা তার সমস্ত লোষ্ট্রকাষ্ঠ দিয়ে প্রকৃতিকে গঙ্গা পার করেছে— তার উপরে আবার এক পাঁচিল দেওয়া নিমতলার ঘাট, মানুষের মরেও সুখ নেই। এখানে আমরা ক'জনে মিলে অশোক-কাননের নীড়ের মধ্যে ছিলুম, সেখানে একপ্রকার ইঁটের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করতে চললুম। সেখানকার সেই লক্ষ লক্ষ কয়েদির সঙ্গে municipality-র দুর্গের মধ্যে বন্দি হতে চললুম। শুনে সুখী হলেন তো?

এতদিন ভুলে ছিলেম, কিন্তু আজ আবার আমার সেই পর্দা-টানা ঘোমটা-দেওয়া ঘরটি মনে পড়ছে। কিন্তু কোথায় আপনি, কোথায় আপনার সেই ছাতা, পাপোশ-শয্যায় শয়ান সেই পুরাতন জুতোযুগল! আমার সেই হৃষ্টপুষ্ট বিরহিনী তাকিয়া— সে কি আমাদের বিরহে রোগা হয়ে গেছে, আমি তাই ভাবছি। আমার বইগুলো কাঁচের অন্তঃপুর থেকে চেয়ে আছে— কিন্তু কার দিকে চেয়ে আছে? আমার শূন্যহৃদয়া চৌকি দিনরাত্রি তার দুই বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এখন তার এই নীরব আহ্বান কেউ গ্রাহ্য করে না। আমার সেই ঘড়িটা টিক্‌ টিক্‌ করছে, সে বড়ো একটা কাউকে খাতির করে না, সে কেবল সময়ের পদচিহ্নের হিসেব রাখতেই ব্যস্ত। কিন্তু আমার সেই হারমোনিয়ম! সে আপনার নীরব সংগীতের উপর বনাত মুড়ি দিয়ে ভাবছে, ঘড়িটা ব্রাকেটের উপরে দাঁড়িয়ে মিছেমিছি তাল দিয়ে মরছে কেন? দেয়ালগুলো তাকিয়ে আছে— ভাবছে, ঘরের প্রধান আসবাবটা গেল কোথায়? কলকাতার সেই জনতাসমুদ্রের মধ্যে আমার সেই বিরহান্ধকার ঘরটিই কেবল বিজন। তার সেই রুদ্ধ দ্বারের ভিতর থেকে কাতর স্বর উঠছে, রবিবাবু—উ—উ—উ।

রবিবাবু আজ এখান থেকে সাড়া দিচ্ছেন, এই যা—আ—আ—ই।

কলকাতায় ফিরে গিয়ে কি আর আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে না? আপনি কি এখন ইহজন্মের

শব্দার্থ ও টীকা

মতো সব-ডেপুটিপুরে প্রয়াণ করলেন? শীঘ্র আর মুক্তির ভরসা নেই? আইনের গলগ্রহ গলায় বেঁধে আপনি কি তা হলে সর্বিস-সরোবরে একরকম ডুব মারলেন? যাক্, তা হলে আপনার আশা একেবারে পরিত্যাগ করে আমরা আশমানে বিহার করি আর বলাবলি করি, 'আহা, শ্রীশবাবু লোকটা ছিলেন ভালো।'

শব্দার্থ ও টীকা

10

সব্যসাচী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

10.1 প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন আনন্দমঠ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বদেশপ্রেম বা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেন দেশবাসীর মনে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর স্বদেশ ভাবনার পরিচয় দেন 'গোরা', 'চার অধ্যায়' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। পরাধীন জাতির মানুষের কাছে বিপ্লবীর স্থান সবার আগে। দেশের শৃঙ্খল মুক্তির জন্য বিপ্লবীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন অনিশ্চিত বিপর্যয়ের বুকে। দেশপ্রেমের যে আগুন বিপ্লবীদের বুকে জ্বলতে থাকে তাকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করতে চান বিদেশি শাসককে, মুক্তিপথের সমস্ত অন্তরায়কে।

অন্তরায় = বাধা।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসটি পরাধীন ভারতের বিপ্লবী আদর্শ ও সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। 'পথের দাবী'র সব্যসাচী দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত প্রাণ এক আদর্শ বিপ্লবী। এমন অসাধারণ ও বিরল চরিত্রের বিপ্লবীকে অবিশ্বাস্য অসম্ভব চরিত্র বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এ যে কতবড়ো সত্য তা ভারতের মুক্তিকামী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বিপ্লবীদের রোমাঞ্চকর জীবনধারাই তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

বিরল = খুব কম পাওয়া যায়।

'সব্যসাচী' শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের অংশবিশেষ। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।

সব্যসাচী কথার অর্থ যার দু-হাত সমানে চলে। মহাভারতে অর্জুনের এক নাম সব্যসাচী। লেখক বলেছেন, সব্যসাচীর শুধু দু-হাত নয় এই মানুষটির দশ ইন্দ্রিয়ই নাকি সমান বেগে চলে। সমস্ত রচনাংশ জুড়ে সব্যসাচীর অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য কর্মকৃতির পরিচয় নামকরণকে সার্থক করেছে।

কর্মকৃতি = কাজ।

10.2 উদ্দেশ্য

এই রচনাটি পাঠ করে আপনারা

- দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে পারবেন;

শব্দার্থ ও টীকা

- উপলব্ধি করতে পারবেন মুক্তিপথের সমস্ত অন্তরায়কে;
- বুঝতে পারবেন মানব জীবনের যথার্থ গৌরব ও সার্থকতা কী ও কোথায়;
- ব্রিটিশ আমলে বিপ্লবীদের ধরার জন্য কী ব্যবস্থা ছিল—সে কথাও আপনারা জানতে পারবেন;

10.3 মূল পাঠ

(1)

অপূর্ব্ব ফিরিয়া দেখিল, সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোষাকে দাঁড়াইয়া তাহাদের পরিচিত নিমাইবাবু। ইনি বাঙলা দেশের একজন বড় পুলিশ কর্ম্মচারী। অপূর্ব্বর পিতা ইঁহার চাকরি করিয়া দেন, তিনিই ছিলেন ইঁহার মুরুব্বি। নিমাইবাবু তাঁহাকে দাদা বলিতেন এবং সেই সূত্রে অপূর্ব্বরা সকলেই ইঁহাকে নিমাইকাকা বলিয়া ডাকিত। স্বদেশী যুগে অপূর্ব্ব যে ধরা পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে নাই, সে অনেকটা ইঁহার প্রসাদে। পথের মধ্যেই অপূর্ব্ব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের চাকরির সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি যে এদেশে?

সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোষাক = ধুতি পাঞ্জাবি চাদর প্রভৃতি।
মুরুব্বি = অভিভাবক।
ইঁহার প্রসাদে = এঁর দয়ায়।

নিমাইবাবু আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, বাবা, কচি ছেলে তুমি, তোমাকে এতটা দূরে ঘর-দোর মা-বোন ছেড়ে আসতে হয়েচে আর আমাকে হ'তে পারে না? পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন, আমার সময় নেই, কিন্তু তোমার ত আফিসে যাবার এখনও ঢের দেরি আছে। চল না বাবা, পথে যেতে যেতে দুটো কথা শুনি। কতকাল যে তোমাদের খবর নিতে পারিনি তার ঠিক নেই। মা ভাল আছেন? দাদারা?

সকলেই ভাল আছেন জানাইয়া অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কোথায় যাবেন?

জাহাজ ঘাটে। চল না আমার সঙ্গে।

চলুন। আপনাকে কি আর কোথাও যেতে হবে?

নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, হতেও পারে। যে মহাপুরুষকে সংবর্ধনা করে নিয়ে যাবার জন্যে দেশ ছেড়ে এতো দূরে আসতে হয়েচে ; তাঁর মর্জ্জির উপরেই এখন সমস্ত নির্ভর করছে। তাঁর ফটোগ্রাফও আছে, বিবরণও দেওয়া আছে, কিন্তু এখানের পুলিশের বাবারও সাধ্য নেই যে তাঁর গায়ে হাত দেয়। আমিই পারব কি না তাই ভাবছি।

সংবর্ধনা = অভ্যর্থনা।
মর্জি = ইচ্ছা।

অপূর্ব্ব মহাপুরুষের ইঙ্গিত বুঝিল। কৌতূহলী হইয়া কহিল, মহাপুরুষটি কে কাকাবাবু? যখন আপনি এসেচেন, তখন বাঙালী সন্দেহ নেই—খুনী আসামী, না?

নিমাইবাবু কহিলেন, ঐটি বলতে পারব না বাবা। তিনি যে কি, এবং কি নয় একথা কেউ ঠিক জানে না! এঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন চার্জও নেই, অথচ, যে চার্জ আছে তা আমাদের পিনাল কোডের কোহিনুর। এঁকে চোখে চোখে রাখতে এত বড় গভর্ণমেন্ট যেন হিমসিম খেয়ে গেল।

চার্জ = অভিযোগ।
পিনাল কোড = বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তির আইন।
কোহিনুর = অত্যন্ত মূল্যবান রত্ন বিশেষ।

(2)

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, পোলিটিক্যাল আসামী বুঝি?

নিমাইবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ওরে বাবা, পোলিটিক্যাল আসামী ত লোকে তোদেরও এক সময়

পোলিটিক্যাল আসামী = রাজনৈতিক কারণে আসামী।

বলত। কিন্তু সে বললে এঁর কিছুই বুঝা যায় না। ইনি হচ্ছেন রাজবিদ্রোহী! রাজার শত্রু! হাঁ শত্রু বলবার লোক বটে! বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি এই ছেলেটির নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী। মহাভারতের মতে নাকি তাঁর দুটো হাতই সমানে চলত, কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত সরকার বাহাদুরের সুগুপ্ত ইতিহাসের মতে এই মানুষটির দশ ইন্দ্রিয়ই নাকি বাবা সমান বেগে চলে। বন্দুক-পিস্তলে এঁর অভ্রান্ত লক্ষ্য, পদ্মানদী সাঁতার কেটে পার হয়ে যান, বাধে না—সম্প্রতি অনুমান এই যে চট্টগ্রামের পথে পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি বার্মা মুলুকে পদার্পণ করেচেন। এখন ম্যান্ডালে থেকে নদীপথে জাহাজে চড়ে রেঙ্গুনে আসবেন, কিংবা রেলপথে ট্রেনে সওয়ার হয়ে শুভাগমন করচেন, সঠিক সংবাদ নেই,—তবে তিনি যে রওনা হয়েছেন সেকথা ঠিক। তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে কোন সন্দেহ, কোন তর্ক নেই,—শত্রু মিত্র সকলের মনেই তাই স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে আছে এবং নশ্বর দেহটি তাঁর পঞ্চভূতের জিম্মায় না দিতে পারা পর্য্যন্ত, এজন্মে যে এর আর পরিবর্ত্তন নেই তাও সকলে জানি, শুধু এ দেশে এসে কোন্ পথে যে তিনি পা বাড়াবেন সেইটি কেবল আমরা জানিনে। কিন্তু দেখো বাবা, এসব কথা যেন কোথাও প্রকাশ করো না। তাহলে এই বৃদ্ধ বয়সে সাতাশ বছরের পেন্সানটি ত মারা যাবেই হয়ত বা কিছু উপরি পাওনাও ভাগ্যে ঘটতে পারে।

অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া কহিল, এতদিন কোথায় এবং কি করছিলেন ইনি? সব্যসাচী নাম ত কখন শুনেচি মনে হচ্চে না!

নিমাইবাবু সহাস্যে কহিলেন, ওরে বাবা, এই সব বড় লোকদের কি আর কেবল একটা নামে কাজ চলে? অর্জ্জুনের মত দেশে দেশে কত নামই এর প্রচলিত আছে। সেকালে হয়ত শুনেও থাকবে এখন চিনতে পারচো না। আর কি যে ইতিমধ্যে করছিলেন সম্যক ওয়াকিবহাল নই। রাজ-শত্রুরা ত তাঁদের সমস্ত কাজকর্ম্ম ঢাকপিটে করতে পছন্দ করেন না, তবে পুণায় এক দফা তিন মাস এবং সিঙ্গাপুরে আর এক দফা তিন বচ্চর জেল খেটেচেন জানি। ছেলেটি দশ-বারোটা ভাষা এমন বলতে পারে যে বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার ইনি কোথাকার। জারমেনির জেনা না কোথায় ডাক্তারি পাশ করেচে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেচে, বিলেতে আইন পাশ করেচে, আমেরিকায় কি পাশ করেচে জানিনে, তবে সেখানে ছিল যখন, তখন কিছু একটা করেই থাকবে, —এসব বোধ করি এর তাস-পাশা খেলার সামিল,—রিক্রিয়েশান, কিন্তু কিছুই কোন কাজে এলো না বাবা, এর সর্ব্বাঙ্গের শিরা দিয়ে ভগবান এমনি আগুন জ্বেলে দিয়েচেন যে ওকে জেলেই দাও আর শূলেই দাও ঐ যে বললুম পঞ্চভূত ছাড়া আর আমাদের শান্তি স্বস্তি নেই! এদের না আছে দয়া-মায়া, না আছে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, না আছে কোন ঘর-দোর,—বাপরে বাপ! আমরাও তা এদেশেরই মানুষ, কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাঙলা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না!

(3)

অপূর্ব্ব সহসা কথা বলিতে পারিল না,—শিরার মধ্য দিয়া তাহারও যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে আস্তে আস্তে কহিল, এঁকে কি আজ আপনি অ্যারেস্ট করবেন?

নিমাইবাবু হাসিয়া বলিলেন, আগে ত পাই!

অপূর্ব্ব কহিল, ধরুন, পেলেন।

না বাবা, অত সহজ বস্তু নয়। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সে শেষ মুহূর্ত্তে আর কোন পথ দিয়ে আর কোথাও সরে গেছে।

আর যদি তিনি এসেই পড়েন তাহলে?

শব্দার্থ ও টীকা

রাজ[illegible]কর শাসনের প্রতিবাদকারী।
সুগুপ্ত = বিশেষ গোপনীয়।
পদ্মানদী = বাংলার বিখ্যাত এক নদী।
চট্টগ্রাম = পূর্ব বাংলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান।
মুলুকে = অঞ্চলে।
মাণ্ডাল = মান্দালয় (বার্মায় অবস্থিত)।
রেঙ্গুন = ব্রহ্মদেশের (মায়ানমারের) রাজধানী।
পঞ্চভূতে লীন = মৃত্যু হওয়া।
সম্যক = ঠিকভাবে।
পুণা = মহারাষ্ট্রের একটি শহর।
সিঙ্গাপুর = মালয় উপ-দ্বীপের দক্ষিণের একটি শহর।
তাস-পাশা খেলার সামিল = অতিশয় সহজ ব্যাপার।
রিক্রিয়েশান = আনন্দ।
অ্যারেস্ট = (ইং শব্দ) গ্রেপ্তার।

শব্দার্থ ও টীকা

চোখে চোখে রাখা = তীক্ষ্ণ নজর রাখা।

নিমাইবাবু একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, তাঁকে চোখে চোখে রাখবার হুকুম আছে। দুদিন দেখি। ধরার চেয়ে ওয়াচ করার মূল্য বেশি,—এই ত সম্প্রতি গভর্ণমেন্টের ধারণা।

কথাটা অপূর্ব্ব ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ, তিনি যাই হোন। তবুও পুলিশ। তথাপি, তাহার মুখ দিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল। কহিল, এর বয়স কত?

নিমাইবাবু কহিলেন, বেশি নয়। বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যেই।

কি রকম দেখতে?

এইটিই ভারি আশ্চর্য্য বাবা। এত বড় একটা ভয়ঙ্কর লোকের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই, নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত। আমাদের রিপোর্টের মধ্যে এই কথাটাই বিশেষ করে উল্লেখ করা আছে।

অপূর্ব্ব কহিল, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়েই ত এঁর হাঁটা-পথে পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙিয়ে আসা?

নিমাইবাবু বলিলেন, নাও হতে পারে। হয়ত কি একটা মতলব আছে, হয়ত পথটা একবার চিনে রাখতে চায়—কিছুই বলা যায় না অপূর্ব্ব। এঁরা যে পথের পথিক, তাতে সহজ মানুষের সোজা হিসেবের সঙ্গে এদের হিসেব মেলে না,—আজ এঁরই ভুল কি আমাদের ভুল তার একটা পরীক্ষা হবে। এমনও হতে পারে সমস্ত ছুটোছুটিই আমাদের বৃথা।

সর্ব্বান্তঃকরণে = সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে।

অপূর্ব্ব এবার হাসিয়া কহিল, তাই যেন হয় আমি ভগবানের কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি কাকাবাবু।

নিমাইবাবু নিজেও হাসিলেন, বলিলেন, বোকা ছেলে, পুলিশের কাছে একথা কি বলতে আছে? তোমার বাসার নম্বরটা কত বললে? তিরিস? কাল সকালে পারি ত একবার গিয়ে দেখে আসবো। এই সামনের জেটিতেই বোধহয় এদের স্টীমার লাগে,—আচ্ছা তোমার আবার অফিসের সময় হয়ে এল, নতুন চাকরি, দেরি হওয়া ভাল নয়। এই বলিয়া তিনি পাশ কাটাইয়া একটু দ্রুতপদে চলিবার উপক্রম করিতেই অপূর্ব্ব কহিল, শুধু দেরি কেন, আজ অফিস কামাই হয়ে গেলেও আপনাকে ছাড়চিনে। আমি চাইনে যে তিনি এসে আপনার হাতে পড়েন, কিন্তু সে দুর্ঘটনা যদি ঘটেই তবুও ত একবার চোখে দেখতে পাবো। চলুন।

জেটি = স্টীমার, জাহাজ নোঙর করার নির্দিষ্ট জায়গা।
দ্রুতপদে = তাড়াতাড়ি পায়ে।
উপক্রম = উদ্যত।

(4)

ইচ্ছা না থাকিলেও নিমাইবাবু বিশেষ আপত্তি করিলেন না, শুধু একটু সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন, দেখবার লোভ যে হয় তা অস্বীকার করিনে, কিন্তু এ সকল লোকের সঙ্গে কোন রকম আলাপ-পরিচয়ের ইচ্ছে করাও বিপজ্জনক তা তোমাকে বলে রাখি অপূর্ব্ব। এখন আর তুমি ছেলেমানুষ নও, বাবাও বেঁচে নেই,—ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করার দায়িত্ব এখন একা তোমারই।

মুচকিয়া হাসিলেন = মৃদু হাসলেন।
সঞ্চিত = জমা।
ইরাবতী = বর্মার একটি নদী।
ইঙ্গিত = ইশারা।
নিমিত্ত = জন্য।

অপূর্ব্ব হাসিয়া কহিল, আলাপ-পরিচয়ের সুযোগই কি আপনারা কাউকে কখনো দেন কাকাবাবু? দোষ করেননি, কোন অভিযোগও নেই, তবুও তাঁকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় এতদূরে ছুটে এসেচেন।

ইহার উত্তরে নিমাইবাবু শুধু একটু মুচকিয়া হাসিলেন। তাহার অর্থ অতীব গভীর। মুখে কহিলেন, কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্য! এই ছোট্ট একটি কথার আড়ালে পৃথিবীর কত ভাল এবং কত মন্দই না সঞ্চিত হইয়া আছে। এই মনে করিয়া অপূর্ব্ব আর কোন প্রশ্ন করিল না। উভয়ে জেটিতে যখন প্রবেশ করিলেন তখন সেইমাত্র ইরাবতী নদীর প্রকাণ্ড স্টীমার তীরে ভিড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। পাঁচ- সাতজন পুলিশ-কর্ম্মচারী সাদা পোষাকে পূর্ব্ব

হইতেই দাঁড়াইয়াছিল, নিমাইবাবুর প্রতি তাহাদের একপ্রকার চোখের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব্ব তাহাদের স্বরূপ চিনিতে পারিল। ইঁহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়—ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত সুদূর বর্ম্মায় বিদ্রোহী শিকারে বাহির হইয়াছেন। সেই শিকারের বস্তু তাঁহাদের করতলগতপ্রায়। সফলতার আনন্দ ও উত্তেজনার প্রচ্ছন্ন দীপ্তি তাঁহাদের মুখে-চোখে প্রকাশ পাইয়াছে অপূর্ব্ব স্পষ্ট দেখিতে পাইল। লজ্জায় ও দুঃখে সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াতেই অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত ব্যথিত চিত্ত গিয়া যেন কোন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত দুর্ভাগার পদপ্রান্তে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। জাহাজের খালাসীরা তখন জেটির উপরে দড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল, কত লোক রেলিং ধরিয়া তাহাই উদ্গ্রীব হইয়া দেখিতেছে—ডেকের উপরে ব্যগ্রতা, কলরব ও ছুটাছুটির অবধি নাই, হয়ত ইহাদেরই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একজন এমনি উৎসুক-চক্ষে তীরের প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু অপূর্ব্বর চোখে সমস্ত দৃশ্যই চোখের জলে একেবারে ঝাপ্সা একাকার হইয়া গেল। উপরে, নীচে, জলে, স্থলে, এত নর-নারী দাঁড়াইয়া, কাহারও কোন শঙ্কা নাই, কোন অপরাধ নাই, শুধু যে লোক তাহার তরুণ হৃদয়ের সকল সুখ, সকল স্বার্থ, সকল আশা স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়াছে, কারাগার ও মৃত্যুর পথ কি কেবল তাহারই জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে। জাহাজ জেটির গায়ে আসিয়া ভিড়িল, কাঠের সিঁড়ি নীচে আসিয়া লাগিল, নিমাইবাবু তাঁহার দলবল লইয়া পথের দু'ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অপূর্ব্ব নড়িল না। সে সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া একান্তমনে বলিতে লাগিল, মুহূর্ত্ত পরে তোমার হাতে শৃঙ্খল পড়িবে, কৌতূহলী নর-নারী তোমার লাঞ্ছনা ও অপমান চোখ মেলিয়া দেখিবে, তাহারা জানিতেও পারিবে না তাহাদের জন্য তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না। তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং যাহাকে সে কোনদিন দেখে নাই, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও—তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়া-তরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্ব্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয় ; কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ও শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শত কোটি নমস্কার! এত লোকের ভিড়, এত লোকের আনাগোনা, এত লোকের চোখের দৃষ্টি কিছুতেই তাহার খেয়াল ছিল না—নিজের মনের উচ্ছ্বসিত আবেগে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারে তাহার গণ্ড, তাহার চিবুক, তাহার কণ্ঠ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সময় যে কত কাটিল সেদিকেও তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ নিমাইবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার তদ্গত বিহ্বল ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিলেন না, বলিলেন, যা ভয় করেছিলাম তাই! পালিয়েছে।

(5)

কি করে পালালো?

নিমাইবাবু কহিলেন, তাই যদি জানব ত সে কি পালায়? প্রায় শ তিনেক যাত্রী, বিশ- পঁচিশটা সাহেব ফিরিঙ্গী, উড়ে, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী তাও শ-দেড়েক হবে, বাকি বর্মী—সে যে কার পোষাক আর কার ভাষা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল তা দেবা না জানন্তি—বুঝলে না বাবাজি—আমরা ত পুলিশ! চেনবার জো নেই তিনি বিলেতের কি বাঙলার! কেবল জগদীশবাবু সন্দেহ করে জন-কয়েক বাঙালীকে থানায় টেনে নিয়ে গেছেন, একটা লোকের সঙ্গে চেহারার মিলও আছে মনে হয়, কিন্তু ওই মনে হওয়া পর্য্যন্ত,—সে নয়। যাবে না কি

শব্দার্থ ও টীকা

করতলগত = হাতের মুঠোয়।
প্রচ্ছন্ন = গোপন।
দীপ্তি = উজ্জ্বলতা।
খালাসীরা = জাহাজের মালপত্র ওঠানামার কাজ করে যারা।
উদ্গ্রীব = খুব আগ্রহী।
ব্যগ্রতা = ব্যস্ততা।
উৎসুক = আগ্রহী।

দুর্গম = যাওয়া যেখানে দুঃসাধ্য।

গুরুভার = কঠিন দায়িত্ব।
মুক্তি পথের অগ্রদূত = অগ্রগামী নেতা যিনি দেশকে মুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
উচ্ছ্বসিত = উচ্ছলিত।
অবিচ্ছিন্ন = ক্রমাগত।
গণ্ড = গাল।

দেবা না জানন্তি = দেবতাও জানেন না।
জো = উপায়।

শব্দার্থ ও টীকা

বাবা, একবার লোকটাকে চোখে দেখবে?

অপূর্ব্বর বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল, কহিল, তাদের যদি মারধর করেন ত আমি যেতে চাইনে।

নিমাইবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, এতগুলো লোককে নিঃশব্দে ছেড়ে দিলাম, আর এ বেচারারা বাঙালী বলেই শুধু বাঙালী হয়ে এদের প্রতি অত্যাচার করব? ওরে বাবা, বাইরে থেকে তোরা পুলিশকে যত মন্দ মনে করিস, সবাই তা নয়। ভাল মন্দ সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু মুখ বুঁজে যত দুঃখ আমাদের পোহাতে হয় তা যদি জানতে ত তোমার এই দারোগা কাকাবাবুটিকে অত ঘৃণা করতে পারতে না অপূর্ব্ব।

অপূর্ব্ব লজ্জিত হইয়া কহিল, আপনি কর্ত্তব্য করতে এসেচেন, তাই বলে আপনাকে ঘৃণা কেন করব কাকাবাবু। এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া কপালে ঠেকাইল। নিমাইবাবু খুশী হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, হয়েচে, হয়েচে। চল, একটু শীঘ্র যাওয়া যাক, লোকগুলো ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সারা হচ্চে, একটু পরীক্ষা করে ছেড়ে দেওয়া যাক। এই বলিয়া তিনি হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির করিয়া আনিলেন।

পুলিশ-স্টেশনে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, সুমুখের হল-ঘরে জন-ছয়েক বাঙালী মোটঘাট লইয়া বসিয়া আছে, জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাহাদের টিনের তোরঙ্গ ও ছোট বড় পুঁটুলি খুলিয়া তদারক শুরু করিয়া দিয়াছেন। শুধু যে-লোকটির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে তাহাকে আর একটা ঘরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহারা সকলেই উত্তর-ব্রহ্মে বর্ম্মা-অয়েল কোম্পানীর তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করিতেছিল, সেখানে জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় চাকরির উদ্দেশে রেঙ্গুনে চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের নাম ধাম ও বিবরণ লইয়া সঙ্গের জিনিসপত্রের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল।

তোরঙ্গ = বাক্স।
তদারক = পরীক্ষা।

পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট = রাজনৈতিকভাবে সন্দেহভাজন ব্যক্তি।

(6)

লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু যেমন রোগা তেমনি দুর্ব্বল। এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। মনে হয় না যে সংসারের মিয়াদ আর তাহার দীর্ঘদিন আছে, ভিতরের কি একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুতবেগে ক্ষয়ের দিকে ছুটিয়াছে। কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি। সে চোখ ছোট কি বড়, টানা, কি গোল, দীপ্ত কি প্রভাহীন, এ সকল বিবরণ দিতে যাওয়াই বৃথা—অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মত কি যে তাহাতে আছে, ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না, সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন। ইহার কোন্ অতল তলে তাহার ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু লুকানো আছে, মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করে না—কেবল এই জন্যেই যেন সে আজও বাঁচিয়া আছে। অপূর্ব্ব মুগ্ধ হইয়া সেইদিকে চাহিয়াছিল, সহসা নিমাইবাবু তাহার বেশভূষার বাহার ও পারিপাট্যের প্রতি অপূর্ব্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সহাস্যে কহিলেন, বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু সখ ষোল আনাই বজায় আছে তা স্বীকার করতে হবে। কি বল অপূর্ব্ব?

সংসারের মিয়াদ = বাঁচার সময়ের পরিধি।
দুরারোগ্য = সেরে ওঠা দুঃসাধ্য।

এতক্ষণে অপূর্ব্ব তাহার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল। তাহার মাথার সম্মুখদিকে বড় বড় চুল, কিন্তু ঘাড় ও কানের দিকে নাই বলিলেই চলে,—এমনি ছোট করিয়া ছাঁটা। মাথায় চেরা সিঁথি—অপর্য্যাপ্ত তৈলনিষিক্ত কঠিন রুগ্ন কেশ হইতে নিদারুণ নেবুর তেলের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে। গায়ে জাপানী সিল্কের রামধনু-রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি, তাহার বুকপকেট হইতে বাঘ-আঁকা একটা রুমালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে, উত্তরীয়ের কোন বালাই নাই। পরণে বিলাতি মিলের কালো মকমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ি, পায়ে সবুজ-রঙের ফুল-মোজা। হাঁটুর উপরে লাল ফিতা দিয়া বাঁধা, বার্নিশ করা পাম্প-শু, তলাটা

তৈল নিষিক্ত = তৈলাক্ত।

উত্তরীয় = চাদর।

মজবুত ও টিকসই করিতে আগাগোড়া লোহার নাল বাঁধানো, হাতে একগাছি হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি,—কয়দিনের জাহাজের ধকলে সমস্তই নোংরা হইয়া উঠিয়াছে— ইহার আপাদমস্তক অপূর্ব্ব বারবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, কাকাবাবু এ লোকটিকে আপনি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই ছেড়ে দিন— যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয়, তার আমি জামিন হতে পারি।

নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্ব্ব কহিল, আর যাই হোক, যাকে খুঁজচেন তাঁর কালচারের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।

নিমাইবাবু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, কহিলেন, তোমার নাম কি হে?

আজ্ঞে, গিরীশ মহাপাত্র।

একদম মহাপাত্র! তুমিও তেলের খনিতেই কাজ করছিলে, না? এখন রেঙ্গুনেই থাকবে? তোমার বাক্স-বিছানা ত খানাতল্লাসী হয়ে গেছে, দেখি তোমার ট্যাঁক এবং পকেটে কি আছে?

তাহার ট্যাঁক হইতে একটি টাকা ও গণ্ডা-ছয়েক পয়সা বাহির হইল, পকেট হইতে একটা লোহার কম্পাস, মাপ করিবার কাঠের একটা ফুটরুল, কয়েকটা বিড়ি, একটা দেশলাই ও একটা গাঁজার কলিকা বাহির হইয়া পড়িল।

নিমাইবাবু কহিলেন, তুমি গাঁজা খাও?

লোকটি অসঙ্কোচে জবাব দিল, আজ্ঞে না।

তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন?

জগদীশবাবু এইসময়ে ঘরে ঢুকিতে নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, দেখ জগদীশ, কিরূপ সদাশয় ব্যক্তি ইনি। যদি কারও কাজে লাগে তাই গাঁজার কলকেটি কুড়িয়ে পকেটে রেখেচেন। দেখি বাবা তোমার হাতটি? এই বলিয়া সেই প্রবীণ, সুদক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারী মহাপাত্রের ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠটি তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল পর্যবেক্ষণ করিয়া সহাস্যে কহিলেন, অনেক গাঁজা তৈরির চিহ্ন এইখানে বিদ্যমান বাবা, বললেই পারতে খাই। কিন্তু ক'দিনই বা বাঁচবে,—এই ত তোমার দেহ,—আর খেয়ো না। বুড়োমানুষের কথাটা শুনো।

মহাপাত্র মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল, আজ্ঞে না মাইরি খাইনে। তবে ইয়ার বন্ধু কেউ তৈরি করে দিতে বললেই দিই,—এই মাত্র। নইলে নিজে খাইনে।

জগদীশবাবু চটিয়া কহিলেন, দয়ার সাগর! পরকে সেজে দিই, নিজে খাইনে! মিথ্যেবাদী কোথাকার!

অপূর্ব্ব কহিল, বেলা হয়ে গেল, আমি তবে চললুম কাকাবাবু।

নিমাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আচ্ছা ; তুমি এখন যেতে পারো মহাপাত্র। কি বল জগদীশ, পারে ত? জগদীশ সম্মতি জানাইলে কহিলেন, কিন্তু নিশ্চয় কিছুই বলা যায় না ভায়া, আমার মনে হয় এ শহরে আরও কিছুদিন নজর রাখা দরকার। রাত্রের মেল-ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, সে যে বর্ম্মায় এসেচে এ খবর সত্য।

জগদীশ কহিলেন, তা হতে পারে, কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ করবার দরকার নেই বড়বাবু। নেবুর তেলের গন্ধে ব্যাটা থানাসুদ্ধ লোকের মাথা ধরিয়ে দিলে!

বড়বাবু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব পুলিশ-স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং প্রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই মহাপাত্র তাহার ভাঙা টিনের তোরঙ্গ ও চাটাই-জড়ানো ময়লা বিছানার বাণ্ডিল বগলে চাপিয়া ধীর মন্থর পদে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া সোজা প্রস্থান করিল।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

ধকলে = কাজের চাপ।

কালচার (culture) = সংস্কৃতি, রুচিবোধ

খানাতল্লাসী = আপত্তিকর জিনিসের অনুসন্ধান।

ফুটরুল (foot rule) = একফুট লম্বা মাপকাঠি।

সদাশয় = উদার।

অঙ্গুষ্ঠ = বুড়ো আঙুল।

বিদ্যমান = বর্তমান।

মাইরি = শপথ।

মেল-ট্রেন = ডাক বহন করে যে ট্রেন।

ওয়াচ (watch) = পাহারা।

মন্থর = ধীর।

প্রস্থান = চলে যাওয়া।

শব্দার্থ ও টীকা

10.4 বিষয়ের রূপরেখা

10.4.1 অপূর্ব ফিরিয়া দেখিল ..... হিমসিম খেয়ে গেল।

বক্তব্যসার:

রেঙ্গুনে চাকরি করছে বাঙালি যুবক অপূর্ব। একদিন সে দেখল সাধারণ ভদ্র বাঙালির পোশাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন বাংলাদেশের এক জবরদস্ত পুলিশ কর্মচারী। অপূর্বর যিনি পূর্ব পরিচিত। অপূর্ব তাঁকে নিমাইকাকা বলে সম্বোধন করে। নিমাইবাবুর সঙ্গে অপূর্বর কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। অপূর্বর বাবা ছিলেন নিমাইবাবুর বন্ধু, তিনিই নিমাইবাবুর চাকরি করে দিয়েছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতাবশে ছাত্রজীবনে স্বদেশি করে অপূর্ব ধরা পড়লেও নিমাইবাবু তাকে শাস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন। নিমাইবাবু অপূর্বর বাবাকে দাদা বলতেন। তাই অপূর্বরা সবাই তাঁকে নিমাইকাকা বলে ডাকত।

নিষ্কৃতি = রেহাই

অপূর্ব রেঙ্গুনে চাকরি পাবার সংবাদ নিমাইবাবুকে জানায় এবং জিজ্ঞেস করে জানতে পারে নিমাইবাবু এখানে এক বিপ্লবীকে তাঁর ভাষায় 'মহাপুরুষ'কে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। বিপ্লবীটির ফটোগ্রাফ, বিবরণ সবকিছু পুলিশের হস্তগত। তবু তাঁকে ধরা বড়ো শক্ত। কারণ বিপ্লবীদের জীবন, কাজকর্ম, গতিবিধি সবই রহস্যময়। তাই নিমাইবাবু বিপ্লবী সব্যসাচী সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি যে কী এবং কী নয়, তা বলা শক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো চার্জ নেই, অথচ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নেপথ্যে তাঁর নেতৃত্ব রয়েছে। তাই পুলিশের ভাষায়, তাঁর বিরুদ্ধে যে চার্জ আছে তা পিনাল কোডের কোহিনুর। এঁকে চোখে চোখে রাখতে গভর্নমেন্ট নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে।

মন্তব্য:

মহাপুরুষ বলতে আমরা সেরকম ব্যক্তিকেই বুঝি যিনি অপরের জন্য নিবেদিত প্রাণ। দেশপ্রেমী সব্যসাচী লৌকিক অর্থে সাধু-সন্ত বা মোক্ষকামী নন।

স্বদেশী যুগ = ১৯৩০ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তাই-ই হল স্বদেশি আন্দোলন। বাংলার মানুষ সোচ্চার হয়েছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। বহু তরুণ এ আন্দোলনে অংশ নেন। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়াস ছিল। সেই আন্দোলনের যুগকেই স্বদেশি যুগ বলে।

পাঠগত প্রশ্ন : 10.1

১. **শূন্যস্থান পূরণ করুন:**

তিনিই ছিলেন ইঁহার _____। নিমাইবাবু তাঁহাকে _____ বলতেন এবং সেই সূত্রে অপূর্বরা সকলেই ইঁহাকে _____ বলিয়া ডাকিত।

২. **একটি বাক্যে উত্তর করুন:**

(ক) নিমাইবাবু কে?

(খ) অপূর্বর সঙ্গে নিমাইবাবুর যখন দেখা হল, তখন তিনি কোথায় যাচ্ছিলেন?

(গ) তাঁর মর্জির উপরেই এখন সমস্ত নির্ভর করছে।—কার মর্জির ওপর?

৩. **সংক্ষেপে উত্তর দিন:**

(ক) 'পুলিশের বাবার সাধ্য নেই তাঁর গায়ে হাত দেয়।'—'পুলিশের বাবার সাধ্য নেই' কথাটিতে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন?

শব্দার্থ ও টীকা

(খ) 'সব্যসাচীকে পিনাল কোডের কোহিনুর'— কোহিনুর কী?

(গ) 'স্বদেশী যুগে অপূর্ব যে ধরা পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে নাই, সে অনেকটা ইঁহার প্রসাদে।'—'ইঁহার প্রসাদে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

10.4.2 অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল ..... বাঙলা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না।

বক্তব্যসার:

সব্যসাচী প্রতিভাবান এক বিপ্লবী। সাধারণ এক পোলিটিক্যাল আসামি তিনি নন। তিনি রাজার শত্রু, রাজবিদ্রোহী। অর্জুনের মতো তাঁর শুধু দুই হাতই সমান চলে না, দশ ইন্দ্রিয়ই সমান সজাগ। বন্দুক পিস্তলে এঁর লক্ষ্য অভ্রান্ত। পদ্মানদী তিনি সাঁতরে পার হন। সম্প্রতি চট্টগ্রামের পাহাড় ডিঙিয়ে বর্মায় এসেছেন। আর খবর পাওয়া গেছে তিনি মান্দালয় থেকে রেঙ্গুনে আসবেন—জলপথে অথবা স্থলপথে। নিমাইবাবু অপূর্বকে জানালেন যে সব্যসাচী পুনায় একবার তিন মাস এবং সিঙ্গাপুরে আর-একবার তিন বছর জেল খেটেছেন।

সব্যসাচী সম্পর্কে নিমাইবাবুর তথ্য থেকে জানা যায় যে তিনি ছিলেন শিক্ষিত এবং সর্ববিদ্যা- বিশারদ। তিনি দশ-বারোটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। পৃথিবীর অনেক দেশে তিনি থেকেছেন এবং বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। জার্মানি থেকে ডাক্তারি, ফ্রান্স থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং, বিলেত থেকে আইন এবং আমেরিকা থেকেও অন্য কোনো ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। এগুলো সবই ছিল তাঁর কাছে তাস-পাশা খেলার মতো সহজ ব্যাপার।

সাধারণত বাঙালিদের অলস, ভীরু প্রকৃতির বলে একটা বদনাম আছে। নিমাইবাবুর মতে সেই অর্থে সব্যসাচী সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী চরিত্র।

মন্তব্য:

গৃহমুখী এবং কর্মবিমুখ বলে বাঙালি চরিত্রের যে অপবাদ রয়েছে তা হয়তো দূর হতে পারে সব্যসাচী চরিত্রের ভূমিকায়। নিমাইবাবু পেশায় স্বদেশিদের শত্রু হলেও তাঁর অন্তরে ছিল তাঁদের প্রতি গোপন সমর্থন ও শ্রদ্ধা। অপূর্ব স্বয়ং সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে তাঁরই অনুগ্রহে সে মুক্তি পায়। সব্যসাচীর গুণপনার তিনি সঠিক মূল্যায়ন করেন ব্যাজস্তুতির ভঙ্গিতে। সব্যসাচীর অগাধ পাণ্ডিত্য, বহু ভাষায় পারদর্শিতা, দুর্গম পথে অভিযানের সফলতা এবং ব্রিটিশ রাজশক্তিকে পর্যুদস্ত করার কাহিনি তিনি যে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তাতে বেশ বোঝা যায় তিনি সব্যসাচীর মতো বীর যোদ্ধার প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাশীল।

ব্যাজস্তুতি = ব্যঙ্গের আড়ালে গভীর অর্থ।
পর্যুদস্ত = পরাস্ত।

পাঠগত প্রশ্ন : 10.2

১. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

সব্যসাচী আইন পাশ করেছে—জার্মানিতে / ফ্রান্সে / বিলেতে।

২. একটি বাক্যে লিখুন:

(ক) সব্যসাচীকে রাজবিদ্রোহী বলা হয়েছে কেন?

(খ) সব্যসাচী সিঙ্গাপুরে কত বছর জেল খেটেছেন?

শব্দার্থ ও টীকা

(গ) কোন্ নদী সব্যসাচী সাঁতার কেটে পার হন?

(ঘ) 'বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে'—কার প্রতিভা প্রশংসাযোগ্য মনে করা হচ্ছে?

৩. **উত্তর সংক্ষেপে দিন:**

(ক) 'কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাঙলা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না'—ছেলেটি সম্পর্কে বক্তা এরকম মন্তব্য করেছেন কেন?

(খ) 'এ সব কথা যেন কোথাও প্রকাশ করো না।'—বক্তা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন কেন?

(গ) 'এ সব বোধ করি এঁর তাস-পাশা খেলার সামিল'—তাস-পাশা খেলার সামিল বলা হল কেন?

10.4.3 অপূর্ব সহসা কথা বলিতে পারিল না ..... তবুও তো একবার চোখে দেখতে পাবো। চলুন।

বক্তব্যসার:

সব্যসাচীকে অ্যারেস্ট করা নিমাইবাবুর উদ্দেশ্য কি না অপূর্ব জানতে চায়। নিমাইবাবু বলেন, 'আগে তো সন্ধান পাওয়া যাক। সরকারের কাছে ধরার চেয়ে ওয়াচ করার মূল্য বেশি।'

সব্যসাচীর বয়স তিরিশ-বত্রিশের মধ্যে হবে। দেখতে সে একেবারেই সাধারণ মানুষ। চেহারায় কোনো ভয়ংকরত্ব নেই। পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে আসার পিছনে ধরা পড়ার আশঙ্কা কারণ হিসাবে থাকতে পারে অথবা পথটা চিনে রাখার মতলবও থাকতে পারে। এসব মানুষরা সোজা হিসেবের পথের পথিক নয়। এমনও হতে পারে তাকে ধরা গেল না—ব্যর্থ হল সব ছোটাছুটি। নিমাইবাবুর এসব কথা শুনে অপূর্ব জানায়—'ভগবান করুন, যেন তাই হয়।' নিমাইবাবু হেসে স্নেহের সুরে মৃদু ধমক দিয়ে অপূর্বকে বললেন, পুলিশের কাছে এমন কথা বলতে নেই। অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে বলে অপূর্বকে তিনি এবার নিবৃত্ত করতে চাইলেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত না দেখে অপূর্ব চলে যেতে চাইল না।

মন্তব্য:

সমাজে দু রকমের মানুষ আছে। একদল অতি সাধারণভাবেই জীবনযাপন করে সন্তুষ্ট থাকে। তারা নিজেদের ছোটো সংসারেই থাকে আবদ্ধ। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করাই তাদের লক্ষ্য। এ ধরনের বিষয়ী মানুষেরা জীবনকে সহজভাবে সোজাপথে দেখতেই অভ্যস্ত। সংসার জীবনে যোগ-বিয়োগের হিসেব কষে লাভের দিকেই এদের সমস্ত ঝোঁক।

আর দ্বিতীয় দলের মানুষ হচ্ছেন সব্যসাচী জাতীয় অসাধারণ মানুষেরা। তাঁরা সর্বত্যাগী ঋষির মতো। ব্যক্তিস্বার্থ, সংকীর্ণ গৃহকোণ—এঁদের কাছে কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি করে না। দেশের জন্য, দশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে এমনকি জীবন বিসর্জন দিয়েও এঁরা নিজেদের ধন্য মনে করেন। সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মাপকাঠি দিয়ে এঁদের মূল্যায়ন করা যায় না কখনও। এঁদের জীবনে চলার পথ কণ্টকময়, আত্মত্যাগই এঁদের জীবনের চরম ব্রত।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 10.3

১. একটি বাক্যে লিখুন:

(ক) 'না বাবা, অত সহজ বস্তু নয়'—কোন্ বিষয়টিকে সহজ বস্তু নয় বলা হয়েছে?

(খ) এই ত সম্প্রতি গভর্নমেন্টের ধারণা—কোন্ গভর্নমেন্ট?

(গ) সব্যসাচীর বয়স কত?

(ঘ) ভগবানের কাছে অপূর্বর প্রার্থনাটা কী?

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

(ক) 'তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত।'—চেনা ও ধরা শক্ত কেন?

(খ) 'সহজ মানুষের সোজা হিসেবের সঙ্গে এঁদের হিসেব মেলে না।'—'সহজ মানুষের সোজা হিসেব' বাক্যাংশটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

(গ) 'শিরার মধ্য দিয়া তাঁহার যেন আগুন ছুটিতে লাগিল।'—'আগুন ছুটিতে লাগল' বলে আসলে কী বোঝানো হয়েছে?

10.4.4 ইচ্ছা না থাকিলেও ..... যা ভয় করেছিলাম তাই! পালিয়েছে।

বক্তব্যসার:

জাহাজ এসে জেটিতে লাগতেই সুরু হয়ে গেল চারপাশের কোলাহল। যাত্রীদের কলরবে, খালাসিদের ব্যস্ততায় তখন মুখরিত জাহাজঘাট। বিদ্রোহী শিকারের আনন্দ আর উত্তেজনা পুলিশবাহিনীর চোখেমুখে। খালাসিরা জেটির ওপর দড়ি ছুঁড়ে ফেলছে। জেটির গায়ে জাহাজ লাগলে নিমাইবাবু দলবল নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দু ধারে দাঁড়িয়ে পড়েন। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে যাত্রীরা একে একে নেমে আসছে। অপূর্ব কিন্তু তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল পাথর হয়ে। পরাধীন দেশের রাজবিদ্রোহীকে সে মনে মনে শত কোটি প্রণাম জানায়। অচেনা অজানা বিপ্লবী মানুষটি এবার শৃঙ্খলিত হবেন, সকলের সামনে তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হবে—এ কথা ভেবে অপূর্ব আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। চোখ থেকে অজস্র ধারায় জল গড়িয়ে পড়ে। গাল দুটো তার ভিজে যায়। এমন সময় নিমাইবাবু জানালেন তাঁর আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। ধরা গেল না সব্যসাচীকে। সে পালিয়েছে।

মন্তব্য:

স্বদেশিযুগে এক অর্থে প্রায় সমস্ত বাঙালি যুবকই ছিল বিপ্লবী—কেউ ছিল সক্রিয় কর্মী, অন্যেরা জানিয়েছে নৈতিক সমর্থন। অপূর্বও ছিল এদের দলে। ছাত্রজীবনে স্বদেশি দলে যোগ দিয়েও শাস্তির হাত থেকে সে বেঁচে গেছে নিমাইবাবুর কৃপায়। তাই নিমাইবাবুর মুখে সব্যসাচীর দেশপ্রেম, ও অন্যান্য গুণের কথা শুনে তার মন শ্রদ্ধায় ভরে যায়। অপূর্ব তখন ভাবে জনসমক্ষে ধরা পড়ার পর কীভাবে তিনি অপমানিত হবেন, মানুষ বুঝতে পারবে না তাদেরই জন্য তাঁর এই নির্যাতন, তখন তার চোখ দুটি হয়ে উঠল—অশ্রুভারাক্রান্ত। লেখক শরৎচন্দ্র অপূর্বকে নরম- কোমল মনের মানুষ করেই এঁকেছেন। স্বাজাত্যবোধ, স্বদেশবৎসলতা, সহানুভূতি-মমত্ব-সহমর্মিতা তার চরিত্রের অন্যতম গুণাবলি। সে ভাবপ্রবণ আবেগপ্রবণ ঠিকই, তবে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত, মুক্তিপথের বীর

শব্দার্থ ও টীকা

যোদ্ধার জন্য তার হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন একান্তই সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

পাঠগত প্রশ্ন : 10.4

১. একটি বাক্যে উত্তর দিন:

(ক) 'ইহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়'—কাদের কথা বলা হয়েছে?

(খ) 'রেলিং ধরিয়া তাহাই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতেছে।'—তারা কী দেখছিল?

(গ) যা ভয় করেছিলাম তাই!—বক্তা কী ভয় করেছিলেন?

(ঘ) কোন্ নদীর জেটিতে স্টিমার এসে ভিড়ল?

২. অনধিক তিনটি বাক্যে লিখুন:

(ক) 'মুক্তিপথের অগ্রদূত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

(খ) সব্যসাচীকে রাজবিদ্রোহী বলা হয়েছে কেন?

(গ) জাহাজ ঘাটের দৃশ্য দেখে অপূর্বর চোখ ঝাপসা হয়ে গেল কেন?

10.4.5 কী করে পালালো? ..... হাজির করা হইল।

বক্তব্যসার:

যার উদ্দেশ্যে নিমাইবাবুর এই অভিযান—যে জন্য রেঙ্গুনে তাঁকে ছুটে আসতে হল —তা তো সফল হল না। সে কী করে পালাল নিমাইবাবু জানেন না। তবে সন্দেহভাজন কয়েকজন বাঙালি যাত্রীকে 'সব্যসাচী' সন্দেহ করে জগদীশবাবু থানায় ধরে নিয়ে গেছেন। তারা সবাই উত্তর-ব্রহ্মে বর্মা অয়েল কোম্পানির তেলের খনিতে কাজ করত। সেখানের জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় তারা কাজের সন্ধানে চলে এসেছে রেঙ্গুনে। এদের মধ্যে একজনের চেহারার সঙ্গে সব্যসাচীর চেহারার খানিকটা মিলও রয়েছে।

থানায় ওদের ওপর শারীরিক অত্যাচার করা হবে না এ কথা জেনে অপূর্ব নিমাইবাবুর সঙ্গে থানার পথে পা বাড়াল। থানায় গিয়েই দেখল সন্দেহভাজন জনা দুয়েক লোক তাদের টিনের বাক্স আর ছোটো বড়ো পুঁটলি নিয়ে বসে আছে। জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাদের জিনিসপত্র তল্লাশি করে ফেলেছেন। কেবল একজনকেই রাখা হয়েছে আলাদা একটি ঘরে। নাম যার সব্যসাচী মল্লিক। এবার অন্যদের নাম ঠিকানা লিখে ছেড়ে দেওয়া হল আর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সব্যসাচী মল্লিককে হাজির করা হল নিমাইবাবুর কাছে।

মন্তব্য:

সব্যসাচী কাহিনিটি ছোটো গল্প নয়, 'পথের দাবী' উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ মাত্র। কিন্তু উদ্ধৃত এই অংশটি রচনানৈপুণ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প হয়ে উঠেছে।

কাহিনিটির চমৎকারিত্ব দেশপ্রেমিক সব্যসাচীর চরিত্র বর্ণনায়। আর সে বর্ণনা এসেছে নিমাইবাবু ও অপূর্বর কথাবার্তার মাধ্যমে। নিমাইবাবু পুলিশের জবরদস্ত এক অফিসার। তিনি রেঙ্গুনে এসেছেন পিনাল কোডের

শব্দার্থ ও টীকা

কোহিনুর অর্থাৎ অসংখ্য অপরাধে অভিযুক্ত রাজবিদ্রোহী সব্যসাচীকে গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু এ কাহিনির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত নিমাইবাবুর বক্তব্যে রয়েছে সব্যসাচীর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা— কখনও তা প্রকাশ পেয়েছে সরাসরি, আবার কখনও বা ভিন্ন কৌশলে নিন্দার ছলে তিনি আগাগোড়া সব্যসাচীর প্রশংসাই করে গেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 10.5

১. একটি বাক্যে লিখুন:

(ক) জাহাজে যাত্রীর সংখ্যা আনুমানিক কতজন ছিল?

(খ) 'লোকগুলো ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সারা হচ্ছে'—কোন্ লোকগুলো?

(গ) থানায় যাদের নিয়ে আসা হয়েছে তারা রেঙ্গুনে এসেছে কেন?

২. উত্তর লিখুন:

(ক) 'দেবা ন জানন্তি'—বাক্যাংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

(খ) জগদীশবাবু কয়েকজন যাত্রীকে থানায় নিয়ে এসেছিলেন কেন?

10.4.6 লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল ..... সোজা প্রস্থান করিল।

বক্তব্যসার:

গিরিশ মহাপাত্র থানায় প্রবেশ করল কাশতে কাশতে। বয়স তিরিশ-বত্রিশের বেশি নয়। যেমন রোগা তেমনি দুর্বল। হাঁপাচ্ছিল সে। মনে হল কঠিন কোনো রোগে আক্রান্ত,ক্রমশ তার জীবনের মেয়াদ বুঝি শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি বড়োই আশ্চর্যের। মাথার সামনের দিকের চুলগুলো বড়ো বড়ো, পেছনে আর কানের পাশে চুল নেই বললেই চলে। মাথায় চেরা সিঁথি, জবজবে তেল। লেবুর তেলের গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরে গেছে। গায়ে জাপানি সিল্কের রামধনু রঙের পাঞ্জাবি। বুক পকেটে বাঘ আঁকা রুমাল, পরনে বিলিতি মিলের কালো মখমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ি। পায়ে বার্ণিশ করা পাম্পশু, হাতে হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের একটা ছড়ি।

তার বিছানা বাক্স তল্লাশি করে কিছু পাওয়া যায়নি। কিন্তু ট্যাঁক থেকে বেরুলো এক টাকা ছ- গণ্ডা পয়সা আর পকেট থেকে পাওয়া গেল একটা লোহার কম্পাস, ফুট রুল, বিড়ি, দেশলাই আর একটি গাঁজার কলকে।

নিমাইবাবুর প্রশ্নের জবাবে সে জানায়—গাঁজা সে খায় না—পথে কলকেটা পেয়েছে—তাই রেখে দিয়েছে যদি কারও কাজে লাগে।

কিন্তু হাতে গাঁজা তৈরির চিহ্ন দেখে নিমাইবাবু তাকে তিরস্কার করেন।

তবু গিরীশ মহাপাত্র বলল—কেউ খেতে চাইলে সে সেজে দেয় বলেই আঙুলে তার দাগ হয়েছে।

নিমাইবাবু এবার জগদীশবাবুর অনুমতি নিয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু আরও কিছুদিন শহরটাকে নজর রাখা দরকার বলে জানালেন তিনি। এবার অপূর্ব বেরিয়ে যাবার জন্য উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গিরীশ মহাপাত্রও তার ভাঙা টিনের বাক্স ও চাটাই জড়ানো ময়লা বিছানা বগলে চেপে ধীর লয়ে উত্তর দিকের রাস্তা ধরে বেরিয়ে গেল থানা থেকে।

শব্দার্থ ও টীকা

মন্তব্য:

সব্যসাচীই এ কাহিনির নায়ক। তাঁকে দেখতে না পেলেও নিমাইবাবুর বর্ণনায় তিনি আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠেন। কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর আত্মত্যাগের কথা, উপস্থিত বুদ্ধির কথা, সাহসিকতার কথা, দেশ- বিদেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নানা ডিগ্রি লাভের কথা আমাদের চমকে দেয়।

কাহিনির শেষ অংশে গিরীশ মহাপাত্রের ছদ্মবেশে আমরা সব্যসাচীকে প্রত্যক্ষ করি। তাঁর শৌখিন বেশ, মাথায় নেবুর তেলের গন্ধ, পকেটে গাঁজার কলকে নিয়ে মিথ্যাভাষণ হাস্যরসের এক অনবদ্য উদাহরণ।

এ কাহিনির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল সব্যসাচীর উপস্থিতিই আমরা প্রত্যক্ষ করি। সে-ই এ কাহিনির প্রাণপুরুষ। সুতরাং কাহিনিটির নামকরণও যথাযথ ও সার্থক।

পাঠগত প্রশ্ন : 10.6

১. **পাঠ থেকে শব্দ নিয়ে ভুল সংশোধন করুন:**

লোকটি হাসিতে হাসিতে আসিল। বয়স কুড়ি-বাইশের অধিক নয়, কিন্তু যেমন রোগা তেমনি সবল।

২. **ঠিক চিহ্নে টিক (✓) চিহ্ন দিন:**

(ক) বুক পকেটের রুমালে কোন্ জন্তুর চিহ্ন আঁকা ছিল? (বাঘের / শিয়ালের / হাতির)

(খ) জুতো টিকসই করতে আগাগোড়া নাল বাঁধানো (স্টিলের / লোহার / কাঠের)

৩. **পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন:**

(ক) পায়ে _____ রঙের মোজা।

(খ) বুড়োমানুষের _____ শুনো।

৪. **সংক্ষেপে উত্তর লিখুন:**

(ক) গিরীশ মহাপাত্র নামে লোকটিকে সব্যসাচী বলে সন্দেহ করল কেন?

(খ) 'কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ করার দরকার নেই বড়বাবু'—তাকে কেন জানোয়ার বলা হয়েছে?

(গ) 'আর যাই হোক, যাকে খুঁজচেন তাঁর কালচারের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।'—কালচার বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

10.5 আপনি যা শিখলেন

1. জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করা। কিন্তু সে পথে অনেক বাধা।

2. কূপমণ্ডুক ও ভীরু না হয়ে ঘরের সংকীর্ণ সীমার বাইরে যে বৃহত্তর কর্মময় জগৎ আছে সেখানে নিজেকে যুক্ত করতে হবে।

3. আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে দেশ ও দশের জন্য বিপদসঙ্কুল পথের পথিক হয়ে, আত্মবলিদানে প্রস্তুত

শব্দার্থ ও টীকা

থাকতে হবে।

4. প্রকৃত দেশপ্রেমিককে নানা বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে, নানা অবস্থার মুখোমুখি হবার জন্য তৈরি থাকতে হবে।

10.6 : পাঠান্ত প্রশ্ন

অনধিক দশটি বাক্যে লিখুন ঃ

1. লেখককে অনুসরণ করে সব্যসাচী চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।
2. এ কাহিনিতে সব্যসাচীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না থাকলেও তাঁর নামেই কাহিনিটির নামকরণ করা হল কেন?
3. গিরীশ মহাপাত্রের চেহারা ও পরিচ্ছদের বর্ণনা দিন।
4. পিনাল কোড কী? সব্যসাচীকে পিনাল কোডের কোহিনূর কেন বলা হয়েছে?
5. পুলিশ অফিসার নিমাইবাবুর চরিত্র আলোচনা করুন।
6. 'তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত'—সব্যসাচীকে চেনা ও ধরা শক্ত কেন বুঝিয়ে দিন।
7. ব্যক্তিটির সব্যসাচী নামকরণের সার্থকতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

10.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

10.1

১. মুরুব্বি, দাদা, নিমাই কাকা

২. ক। বড়ো পুলিশ কর্মচারী

খ। জাহাজ ঘাটে

গ। সব্যসাচী মল্লিকের

৩. ক। পুলিশের সমস্ত শক্তির অসাধ্য

খ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি

গ। কৃপায়

10.2

১. বিলেতে

২. ক। রাজার শত্রু

খ। তিন

শব্দার্থ ও টীকা

গ। পদ্মা

ঘ। ছেলেটির নামকরণ যিনি করেছেন

৩. ক। বাঙালির ব্যতিক্রমী চরিত্র

খ। চাকরির নিরাপত্তা

গ। অবসর বিনোদনের মতো সহজ সরল

10.3

১. ক। গ্রেপ্তার করা

খ। ব্রিটিশ

গ। ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে

ঘ। ব্যর্থ ছোটাছুটি

২. ক। সাদামাঠা চেহারা, বহু ভাষাবিদ, ছদ্মবেশ ধারণে দক্ষ

খ। দেশের কথা ভুলে আত্মসর্বস্বতার জীবনে বিভোর

গ। উত্তেজনার আগুন

10.4

১. ক। পুলিশ কর্মচারী

খ। দড়ি ছোঁড়া

গ। ছোটাছুটি বৃথা

ঘ। ইরাবতী

২. ক। ইংরেজ শাসনের পতনের পথ প্রদর্শক

খ। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

গ। সব্যসাচীর কথা ভেবে

10.5

১. ক। প্রায় শ তিনেক

খ। থানায় টেনে আনা সন্দেহভাজন লোকগুলো

গ। অসুস্থতা, চাকরির সন্ধান

২. ক। পালানোর কারণ দেবতারও অজানা

শব্দার্থ ও টীকা

খ। জেরা করবার জন্য

10.6

১. হাসিতে হাসিতে নয়, কাশিতে কাশিতে

কুড়ি-বাইশের নয়, তিরিশ-বত্রিশের

সবল নয়, দুর্বল

২. ক। বাঘের

খ। লোহার

৩. ক। সবুজ

খ। কথাটা

৪. ক। বাঙালি, চেহারার মিল, চোখের দৃষ্টি

খ। বৈচিত্র্যপূর্ণ চেহারা, বেশভূষার বাহার ও পারিপাট্য

গ। শিক্ষাদীক্ষা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ভব্যতা-সভ্যতা

লেখক পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) জন্মগ্রহণ করেন হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মা হলেন ভুবনমোহিনী দেবী। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি / দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি'। শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অমর আসনেই আসীন শুধু নন, অন্য ভারতীয় ভাষায় তাঁর গ্রন্থ অনূদিত হয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও পাঠকদের চিত্ত সমভাবেই জয় করেছে। তাঁর 'পথের দাবী' ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহের বাণী প্রচারের অপরাধে বাজেয়াপ্ত করেছিল। অত্যন্ত জনপ্রিয় কয়েকটি গ্রন্থ তিনি লিখে গেছেন, যেমন—শ্রীকান্ত, গৃহদাহ, চরিত্রহীন, দত্তা, শেষ প্রশ্ন, নববিধান, পল্লীসমাজ, দেনা পাওনা প্রভৃতি।

তাঁর কালজয়ী গল্পগুলির মধ্যে রামের সুমতি, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, একাদশী বৈরাগী, মেজদিদি প্রভৃতি শুধু উল্লেখযোগ্যই নয়, বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ সমাজ-সচেতনতার দিশারী। 'নারীর মূল্য', 'তরুণের বিদ্রোহ', 'স্বদেশ ও সাহিত্য' প্রভৃতি। ছোটোদের জন্যও বিশেষ রচনা তাঁর সাহিত্য-কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে।

শব্দার্থ ও টীকা

সমধর্মী রচনা

(১) '**চার অধ্যায়**'—লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২) '**জাগরী**'—লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী।

(৩) '**ভুলি নাই**'—লেখক মনোজ বসু।

(৪) '**বদনাম**'—গল্প, লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শব্দার্থ ও টীকা

11

অতীতের বোঝা

এস. ওয়াজেদ আলি

11.1 প্রস্তাবনা

ভারতের সভ্যতা অতি প্রাচীন। এই সভ্যতা বৈদিক যুগের।ভারতীয় পণ্ডিতেরা প্রায়ই বৈদিক যুগের উন্নত সমাজ ব্যবস্থার উল্লেখ করেন।

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয়ই কিছু গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তাই বলে অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকলেই চলবে না। সভ্যতার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকেই নিজ নিজ জড়তা, অভিমান ত্যাগ করে একত্রে কাজ করতে হবে, তাহলেই জাতির পরিত্রাণ।

এই প্রসঙ্গে লেখক পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যেমন গ্রিক, মিশরীয় এবং আরবীয়দের কথা বলেছেন। গ্রিকরাও একদিন উন্নতির শিখরে উঠেছিল। কিন্তু প্রাচীনের প্রতি মোহ তাদের পতন ডেকে আনে। পক্ষান্তরে আরব জাতি এক মেষপালক জাতি ছিল। হজরত মোহম্মদের আবির্ভাবের ফলে সেদেশে অগ্রগতি শুরু হয় এবং প্রায় ৪০০ বছর আরবীয় সভ্যতা উন্নতির শিখরে ছিল। এমনকি ইউরোপীয় সভ্যতা আরবদের সংস্পর্শে এসেই উন্নত হয়। তারপর তারা এগিয়ে চলে। কিন্তু প্রাচীনতার বাঁধ আরবদের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক (বাধা) হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমানে বিভেদ হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকেই গ্রাস করেছে। অতীতের বোঝা নিয়ে উভয়েই আজ বিভেদের জটাজালে আবদ্ধ।

11.2 উদ্দেশ্য

এই রচনাটি পড়ে আপনারা —

- জাতীয় সংহতি বিষয়ে জানতে পারবেন।
- প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হবেন।
- বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

11.3 মূল পাঠ

(1)

পুরাতত্ত্ববিদদের মুখে শুনতে পাওয়া যায় যে, ভারতের সভ্যতা অতি প্রাচীন। ইংরেজদের পূর্ব-পুরুষেরা যখন নানা রকম রং মেখে সং সেজে উলঙ্গ শরীরে বন্য পশুর ন্যায় জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন তখন নাকি এদেশে শুধু দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের আলোচনা হত। এই প্রাচীন সভ্যতার গৌরব নিয়ে আমরা এখন বুক ফুলিয়ে বেড়াই। কেউ কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা পাড়লে তখনই কোনো না কোনো বিদ্যা-দিগ্‌গজ চোখ রাঙিয়ে উত্তর দেন, ''ওসব আর বিলেত থেকে আমদানি করতে হবে না। ও-সব এবং আরও অনেকরকম জিনিস এদেশে ছিল। পরের কাছে শেখবার আমাদের আর কিছু নেই। যা-কিছু থাকা উচিত বৈদিক যুগে সবই ছিল। গোলযোগ ঘটেছে কেবল পৌরাণিক যুগে আর মুসলমান যুগে। তাই বলি আমাদের নূতন কিছু করতে হবে না, পুরোনো জিনিসগুলোর পুনরুদ্ধার করলেই সব চুকে যাবে।'' বক্তৃতার সঙ্গে কতগুলো সংস্কৃত শ্লোকের বাদাম-কিশমিশ মিশিয়ে পণ্ডিতমশায় নিরীহ শ্রোতার মানসিক ভোজনের মুখরোচক ব্যবস্থা করেন। শ্রোতা সাদাসিধা লোক, এত বক্তৃতা, এত শ্লোক আওড়ানো, হাত-পা নাড়া এবং মুখ ভেঙচানো দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়, ভাবে এর ভিতর কিছু সার না থাকলে পণ্ডিত-প্রবর এতটা বাচালতা আর এতটা আত্মতুষ্টি কখনোই দেখাতে পারতেন না। শ্রোতার অত-শত ভাববার সময় নেই, পড়বারও সময় নেই, আর আলোচনা করবার সময় তো নেই-ই। তাছাড়া বেচারি সংসারী লোক, রুটিনের বাইরে যাবার ইচ্ছাও কম, আর সাহসও অল্প। পণ্ডিতের কথা তার মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিক অলসতার অনুকূল হওয়ায় সে মাছের টোপ গেলার মতো টপ করে সেটাকে গিলে ফেলল। ফলে পণ্ডিতের মর্যাদা বাড়ল, নব্যতান্ত্রিকদের যথেষ্ট নির্যাতন হল, এবং জনসাধারণের পক্ষে নিরুদ্বেগে নিদ্রাদেবীর আরাধনার সুযোগ ঘটল।

ক্ষতি হল কিন্তু দেশের। প্রকৃতির এই একটা মহা দোষ যে, সে বক্তৃতা শোনে না। প্রকৃতি কোন্ দয়াময় সর্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্তৃক রচিত হয়েছে, কী অণু-পরমাণুগুলোর উদ্দেশ্যবিহীন আকস্মিক সংযোগে ঘটেছে, সে বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মস্ত মতভেদ আছে। আমার কিন্তু ধারণা যে বঙ্গদেশীয়দের পক্ষে প্রকৃতির এই বক্তৃতার প্রতি বিরাগই তার অনৈশ্বরিক উদ্দেশ্যহীনতার যথেষ্ট প্রমাণ। প্রকৃতির যদি মাথামুণ্ড থাকত, তাহলে এত বড়ো বড়ো বক্তৃতা সত্ত্বেও আমাদের দেশের এ দুরবস্থা হবে কেন?

সত্য কথা এই যে, আমাদের এত জ্ঞানগরিমা সত্ত্বেও, সত্যের সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনের সম্বন্ধ অতি অল্প। এই সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধাই আমাদের দুরবস্থার প্রধান কারণ। আমরা বক্তৃতা করতে শিখেছি, বিকট মুখভঙ্গি করে ইংরেজি শব্দরাজির অপূর্ব সমাবেশ করতে শিখেছি, কিন্তু সত্যের অনুসন্ধান করতে, তাকে নতশিরে মেনে নিতে এবং তার প্রচারের জন্য দৃঢ়সংকল্প হতে শিখিনি। সে শিক্ষা যদি আমাদের থাকত তাহলে ঐতিহাসিক কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন প্রাচীনকাল থেকে আমরা খুঁজে খুঁজে কতকগুলো অসম্ভব তথ্য আমাদের আত্মশ্লাঘা চরিতার্থ করবার জন্য বার করবার ভান করতাম না এবং সেইগুলো নিয়ে অহংকারে স্ফীত হয়ে আধুনিক সমস্যা সকলকে উপেক্ষা করে 'তাইরে-নারে-না' গেয়ে ঘুরে বেড়াতুম না। এরূপ ব্যবহার ব্যক্তিগত কিংবা জাতীয় স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নয়। যদি কিছুর পরিচায়ক হয় তো সে জাতীয় দুর্বলতার ও নিস্তেজতার।

শব্দার্থ ও টীকা

পুরাতত্ত্ববিদ = প্রাচীনকালের ইতিহাসে পণ্ডিত ব্যক্তি।

নীতিশাস্ত্র = ন্যায়-অন্যায় ও কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে বিচার বিষয়ক গ্রন্থ।

বিদ্যাদিগ্‌গজ = অতিমূর্খ (বিদ্রূপে)।

আত্মসন্তুষ্টি = যথেষ্ট তৃপ্তির ভাব।

নৈতিক = নীতি বিষয়ক।

সামাজিক = সমাজের বিষয়ে।

নব্যতান্ত্রিক = নতুন বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

বিরাগ = বিরক্তি।

অনৈশ্বরিক = ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নয়।

অনুসন্ধান = খোঁজ-খবর।

কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন = কুয়াশা-আবৃত।

স্ফীত = ফেঁপে ওঠা।

(2)

পাঠক জিজ্ঞাসা করবেন যে, প্রাচীনদের অবলম্বিত পথের অনুসরণ করলেই কি স্বভাবের নিয়ম ভাঙা হল? আমার উত্তর এই যে, প্রাচীনকালের নজিরকে উপরোক্ত রূপ ভয়-ভক্তি-বিহ্বলনেত্রে দেখা এবং তার বিধানের পায়ে সসম্ভ্রমে আত্মসমর্পণ করা উন্নতির স্বাভাবিক নিয়মের লঙ্ঘন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবী পরিবর্তনশীল, দুই মুহূর্তের অবস্থা কখনও এক হয় না। আজিকার দিন কালিকার দিনের অবিকল নকল হতে পারে না, কারণ, আজ এবং কালের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটছে তার সমষ্টি আজ-কে কাল থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন করে ফেলেছে; তার দরুণই আজ হচ্ছে আজ আর কাল হচ্ছে কাল; কোনো পার্থক্য না থাকলে আমরা আজ আর কালের মধ্যে কোনো মতেই প্রভেদ করতে পারতাম না। বৈজ্ঞানিকের নজরে পৃথিবীর এক পলের অবস্থা আর এক পলের অবস্থা থেকে ভিন্ন। একথা যদি সত্য হয় তাহলে মহাভারতের কিংবা বৈদিক যুগের অবস্থার সঙ্গে আজিকার অবস্থার যে প্রভেদ আছে তাতে তো কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। এসব সূক্ষ্ম তর্ক ছেড়ে যদি ঐতিহাসিক সত্যের ওপর নির্ভর করে বিচার করা যায়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, ভারতের দুই যুগের অবস্থাতে প্রভেদ বিস্তর ও বিরাট। প্রাচীনকালে (যথা— মনুর যুগে) ভারতে এক হিন্দুজাতিরই বাস ছিল। মুসলমান খ্রিস্টান প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকেরা এখানে ছিল না। তখনকার নীতিপ্রবর্তকদের কেবল এক হিন্দুসমাজের কথা ভাবতে হয়েছে। এখন কিন্তু দেশের অবস্থা একেবারে বদলে গেছে। এখন এদেশে হিন্দু ছাড়া মুসলমান, পারসি প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা বাস করছে। বিদেশিরা এখন এদেশের রাজা হয়েছেন। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এখন এদেশের লোকের পূর্বাপেক্ষা অনেক বেড়ে গেছে। এইসব নূতন ঘটনা ঘটাতে দেশে নূতন নূতন জীবন-সমস্যা এসে জুটেছে। এসব সমস্যার কিরূপ মীমাংসা হওয়া উচিত সে বিষয় মনু এবং তাঁর সমসাময়িকদের ভাববার সুযোগ হয়নি; সুতরাং এসব বিষয় তাঁরা কিছুই লিখে যাননি। এখন হিন্দুদের উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যেই এসব সমস্যার মীমাংসা করতে হবে। মনু যখন হিন্দুর সামাজিক শ্রেণি-বিভাগের প্রবর্তন করেন, তখন ইউরোপের democratic হাওয়া এদেশে আসেনি, এখন কিন্তু এসেছে এবং তেড়েই এসেছে। এখন হিন্দু যদি জাতিভেদের বাসি মড়া নিয়ে বসে থাকে তাহলে ভারতবর্ষ থেকে তার লোপ পাবার সম্ভাবনাই বেড়ে যাবে। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এ-সকল সত্য থেকে কেবল একটিমাত্র সিদ্ধান্তে আসা যায় এবং সেটা এই যে নূতন যুগের নূতন সমস্যার নূতন মীমাংসার দরকার।

প্রাচীন গ্রিসের কথা একবার মনে করুন। প্রাচীন মিশরীয় পুরোহিত সোলোনকে (Solon) বলেন ''তোমাদের গ্রিকদের চরিত্র বালকের মতো; তোমাদের মধ্যে না-প্রাচীনকাল-বিষয়ক জ্ঞান আছে, না জ্ঞানের প্রাচীনতা আছে।'' মিশরি যাকে নিন্দনীয় বলে বিদ্রূপ করেন সেই গুণেরই বলে গ্রিস উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল; তাদের বাল-সুলভ চঞ্চলতা ও অসন্তোষই তাদের সভ্যতাকে উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে তুলেছিল। যে-দিন এই বালস্বভাব তাদের পরিত্যাগ করলে, যে-দিন তারা জাতীয় কৃতকার্যতায় সন্তুষ্ট হয়ে পূর্বকীর্তির চর্বিত চর্বণে প্রবৃত্ত হল সেইদিন থেকে গ্রিসের অধঃপতনও শুরু হল।

যা গ্রিসে ঘটেছিল আরবেও তাই ঘটেছে। একটি মেষপালক বর্বর জাতি এক মহাপুরুষের অপূর্ব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ''আল্লাহো আকবর'' রবে সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল। মহাপুরুষদত্ত মন্ত্রের ভীমনাদে সেকালের রাজ্য সাম্রাজ্যগুলো বাষ্পনির্মিত সৌধসম আকাশে বিলীন হয়ে গেল; আরব সভ্যজগতে প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন হয়ে মৃতপ্রায় সভ্যতাকে নবজীবন দান করল। দেশ বিদেশ দমন করে, পাহাড় পর্বত লঙ্ঘন করে, সমুদ্র মহাসমুদ্র মন্থন করে আরব যে সভ্যতা গড়েছিল, তা অপূর্ব। আরবের এই উন্নতি পৈতৃক প্রথার অনুসরণে হয়নি। হজরত মোহাম্মদের পূর্বকালীন অবস্থাকে তারা ''আইয়ামে জাহেলিয়াৎ'' (অন্ধকার যুগ) বলত। হজরতের সময় থেকে

বিহ্বলনেত্রে = শ্রদ্ধা ও ভীতিভূত চোখে

এক পলের = এক মুহূর্তের।

মনু = ইনি ব্রহ্মার দেহ থেকে উদ্ভূত। সেইজন্য এঁর নাম স্বয়ম্ভু-মনু। মনে করা হয় এঁর পুত্রকন্যাগণ থেকে মানুষ জাতির বিস্তার, তাই তাদের বলা হয় 'মানব'। ইনি ব্রহ্মার কাছ থেকে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই ধর্মশাস্ত্রই ''মনুসংহিতা'' নামে খ্যাত। মনুর যুগ বলতে এই ঋষির সমসাময়িক যুগকেই বোঝানো হয়েছে। মনুর যুগে ভারতবর্ষে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল।

democratic = গণতন্ত্র সম্পর্কীয়।

মীমাংসা = বিরোধ সমস্যা প্রভৃতির সমাধান।

রঙ্গমঞ্চে = যুদ্ধক্ষেত্রে।

ভীমনাদ = উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা।

মন্থন = মন্থিত করা।

হজরত মোহাম্মদ = আল্লার প্রেরিত দূত। ইনি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। তাঁকে পয়গম্বর নামে অভিহিত করা হয়।

আরম্ভ করে প্রায় চারশত বৎসর পর্যন্ত আরবেরা ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল। এই উন্নতির যুগে তারা নিত্যনতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিল এবং নানা দিকে নূতন নূতন experiment করেছিল। তার পর প্রাচীনতার বাঁধ তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। উন্নতির প্রবাহ বন্ধ হল। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা ব্যবহারজীবী (ফকিহ) এবং পুরাতত্ত্ববিদদের (মেহাদ্দেস প্রভৃতি) ইজ্জত বেশি হল। এইখান থেকেই আরবের প্রাণহীন জীবন আরম্ভ হল।

শব্দার্থ ও টীকা

experiment = অনুসন্ধান, পরীক্ষা।

ইজ্জত = সম্মান।

(3)

সভ্যতা দেখতে পাই কালক্রমে এক জাতির হাত থেকে আর-এক জাতির হাতে যায়, এবং তা হয়, যার হাতে যায় তার গুণে, আর যার হাত থেকে যায়, তার দোষে। আরবের জরা-শিথিল হাত থেকে ইউরোপীয়রা সভ্যতার পতাকা কেড়ে নিয়ে দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হল। ইউরোপের তামসিক যুগের অবসান হল। শ্রাবণের ধারায় স্ফীত স্রোতস্বতীর ন্যায় তাদের জীবন-স্রোত প্রবাহিত হতে লাগল। সে স্রোত এখনও থামেনি। তামসিক যুগে ইউরোপও আমাদের মতোই authority -র উপাসক ছিল। প্রাচীনকালের উপর সেখানেও তাদের আমাদেরই মতো অটল ভক্তি ছিল। Aristotle -এর উপর কথা বলবার ক্ষমতা কোনো বৈজ্ঞানিকেরই ছিল না। বিজ্ঞানের সত্যতা পুরোহিতদের খামখেয়ালির উপর নির্ভর করত। ইউরোপের সৌভাগ্য যে, তাদের সে মনোভাব চলে গেছে। এখন জীবনের আদর্শের সঙ্গে অতীতের বিধি-নিষেধের কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইউরোপীয়রা স্বীকার করেন না। তাঁরা এখন নিত্যনতুন জিনিসকে নিয়ে experiment করছেন, এক নীতি ছেড়ে অন্য নীতি ধরছেন, এইরূপে তাদের আশা ও উদ্যমপূর্ণ জীবন কেটে যাচ্ছে। রোজই তাদের আত্মশক্তি বাড়ছে বই কমছে না।

তামসিক = ঘোর অন্ধকার।

authority = কর্তৃপক্ষ, শাসক।

Aristotle = প্রসিদ্ধ গ্রিক দার্শনিক ও সাহিত্য তত্ত্বের স্রষ্টা।

ভারতবর্ষ যে এই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত, তা নয়। ভারতের হিন্দুজাতির মধ্যেও একসময় সভ্যতার ক্রমবিকাশ হয়েছিল। তখন তাদের মধ্যে বার্ধক্যের দুর্বলতা আসেনি। যৌবন-সুলভ চঞ্চলতার প্রসাদে তারা নানা নীতির অনুসরণ করেছিল, নানা মতের প্রবর্তন করেছিল, নানাবিধ সামাজিক বিধানের সৃষ্টি করেছিল এবং নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কাব্য ও কলাবিষয়ক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় experiment করেছিল। ক্রমে তাদেরও বার্ধক্য উপস্থিত হল। জীবনে জড়তা এসে পড়ল। ষোড়শোপচারে প্রাচীনতার পুজো আরম্ভ হল। ফলে এই হল যে, হিন্দুজাতি নির্জীবতার একটা মস্ত উদাহরণস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল।

ষোড়শোপচারে = ঘটা করে।

আমাদের Nation — হিন্দু এবং মুসলমান, এই দুয়ে মিলে গঠিত। এই দুই সমাজই নিজেদের জীবনের মূল্য ভুলে গিয়ে প্রাচীন প্রথার অনুসরণের বৃথা চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করছে। এর ফল যে বিষময় হচ্ছে, সে বিষয় সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। চোখ খুলে চারিদিকে চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন যে এ পৃথিবী এক অনন্ত সংগ্রামের ক্ষেত্র। এখানে মানুষে-মানুষে, মানুষে-পশুতে এবং পশুতে-পশুতে অবিরাম জীবন সংগ্রাম চলেছে। এ সংগ্রামে যে জাতি নিত্য কালোপযোগী প্রথার উদ্ভাবন করতে পারে সে জাতিই টিকে যায়, অন্যেরা লোপ পেয়ে যায়। অতীতের গুরুভার ঘাড়ে করে যার পক্ষে চলাই কঠিন, তার পক্ষে এই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার আশা কোথায়? আমরা যেভাবে চলছি সেভাবে আর ক'দিন চলবে? অতীতের বোঝা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবার শক্তি কি আমাদের দেহে কখনোই জন্মাবে না? কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি বিশেষ করে হিন্দুসমাজের উপর আক্রমণ করছি। এদেশে হিন্দু-মুসলমান দুজনেই নিজ নিজ অতীতের চাপে বসে পড়েছে, দুজনের দশাই সমান, এবং সে দশার নাম হচ্ছে দুর্দশা।

Nation = জাতি।

উদ্ভাবন = আবিষ্কার।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

দুর্দশার কথা।

11.4 বিষয়ের রূপরেখা

11.4.1 পুরাতত্ত্ববিদদের মুখে . . . . . জাতীয় দুর্বলতার ও নিস্তেজতার

বক্তব্যসার:

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান অসামান্য অগ্রগতির প্রশ্ন তুললেই পুরাতন ব্যবস্থার গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা বৈদিকযুগের উদাহরণ দেন। মনুর যুগে ভারত উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল বলে অহংকার করেন। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে কিছু সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টিকে এমন জটিল করে তোলেন যে শ্রোতারা বক্তার পাণ্ডিত্যের আস্ফালনে ভীত হয়ে চুপ করে থাকে। আসল সত্য চাপা পড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে সত্যের আশ্রয়ে জাতীয় জীবনের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

মন্তব্য:

প্রাচীন সংস্কারকে গ্রহণ করে, প্রাচীন পথকে অনুসরণ করে চললে মানুষের ব্যক্তিগত, শ্রেণিগত কিম্বা জাতিগত কোনো উন্নতিই সম্ভব নয়। কারণ জগতে প্রতিনিয়তই পরিবর্তন ঘটছে। মনুর যুগ আর আজকের যুগ এক নয়। মনুর যুগের সামাজিক শ্রেণিবিভাগ বর্তমানে শ্রেণিসংঘর্ষ তৈরি করছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষে মানুষে বর্ণবিভেদ মেনে নেওয়া যায় না। বর্ণবিভেদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণবিদ্বেষ তৈরি করে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

শুধু ভারত নয়, গ্রিস দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। এই সারল্য নিয়েই তারা উন্নতির শিখরে উঠেছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা তাদের স্বভাব পরিত্যাগ করে পূর্বের সংস্কারে মন দিল, তখনই তাদের জাতীয় উন্নতি পদে পদে ব্যাহত হল।

প্রাচীন আরবদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই সত্য লক্ষিত হয়। সরল মেষপালক এক জাতি হজরত মোহাম্মদের প্রভাবে সভ্যতার গৌরবময় শিখরে আরোহণ করেছিল। কিন্তু সে মাত্র ৪০০ বছর। যেই মাত্র তারা প্রাচীন পথের অনুসরণ শুরু করল, অমনি আরব সভ্যতার উন্নতি খর্ব হতে শুরু করল। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার, আরবের কাছ থেকেই ইউরোপীয় সভ্যতা জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে এক সুসভ্য জাতি হিসাবে প্রশংসা লাভ করেছে।

শ্রেণীসংঘর্ষ = দুই শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিরোধ।

পাঠগত প্রশ্ন : 11.1

পাঠ্যাংশটুকু ভাল করে পড়ুন এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

1. প্রাচীন যুগ বলতে কোন্ যুগের কথা বলা হয়েছে?
2. ভারতের ইতিহাসকে কয়টি যুগে ভাগ করা হয়েছে?
3. আমাদের দুরবস্থার প্রধান কারণ কী?
4. ঐতিহাসিক কুহেলিকা বলতে লেখক কী বলতে চেয়েছেন?

খর্ব = হ্রাস পাওয়া।

শব্দার্থ ও টীকা

11.4.2 পাঠক জিজ্ঞাসা করবেন যে . . . . . আরবের প্রাণহীন জীবন আরম্ভ হল।

বক্তব্যসার:

পরিবর্তনশীল এই জগৎ। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও নানা প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার, সামাজিক রীতিনীতির প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ আজ আর কোনো ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। প্রাচীন গ্রিস ও মিশরীয় সভ্যতার পরিবর্তন ঘটেছে। আরব সভ্যতাও মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাবে উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছিল।

মন্তব্য:

প্রাচীন সংস্কারকে গ্রহণ করে, প্রাচীন পথকে অনুসরণ করে চলতে মানুষের ব্যক্তিগত, শ্রেণিগত কিংবা জাতিগত কোনো উন্নতিই সম্ভব নয়। কারণ জগতে প্রতিনিয়তই পরিবর্তন ঘটছে। মনুর যুগ আর আজকের যুগ এক নয়। মনুর যুগের সামাজিক শ্রেণিবিভাগ বর্তমানে শ্রেণিসংঘর্ষ তৈরি করছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষে মানুষে বর্ণবিভেদ মেনে নেওয়া যায় না। বর্ণবিভেদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণবিদ্বেষ তৈরি করে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

শুধু ভারত নয়, গ্রিস দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা সকলেই ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা তাদের স্বভাব পরিত্যাগ করে পূর্বের সংস্কারে মন দিল, তখনই তাদের জাতীয় উন্নতি পদে পদে ব্যাহত হল।

প্রাচীন আরবেরাও হজরত মোহাম্মদের প্রভাবে সভ্যতার গৌরবময় শিখরে আরোহণ করেছিল। কিন্তু সে মাত্র ৪০০ বছর। যেই মাত্র তারা প্রাচীন পথের অনুসরণ শুরু করল, অমনি আরব সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হল।

পাঠগত প্রশ্ন : 11.2

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বা 'না' লিখুন। একটি উত্তর করে দেখানো হল।

1. প্রাচীনকালের অবলম্বিত পথের অনুসরণ করলেই কি স্বভাবের নিয়ম ভাঙা হল?

   হ্যাঁ / না

   ✓

2. বৈদিক যুগের অবস্থার সঙ্গে আজিকার অবস্থার কোনো পার্থক্য নেই।
3. প্রাচীনকালে মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকেরা এখানে (ভারতে) ছিল না।
4. পাঠে বর্ণিত সমস্যার কীরূপ মীমাংসা হওয়া উচিত সে বিষয় মনু কিছুই লিখে যাননি।
5. মনু হিন্দুর সামাজিক শ্রেণি-বিভাগের প্রবর্তন করেন।
6. মিশরি সোলোন গ্রিকদের কতগুলি গুণকে নিন্দনীয় বলে বিদ্রুপ করেছিলেন, তার ফলে গ্রিসের অবস্থা কী হয়েছিল?
7. প্রাচীন আরবীয়রা কীরূপ জাতি ছিল?
8. কে মৃতপ্রায় আরবসভ্যতাকে নবজীবন দান করেছিলেন?
9. 'আইয়ামে জাহেলিয়ৎ' শব্দের অর্থ কী? আরব দেশে কোন্ সময়কে আইয়ামে জাহেলিয়াৎ বলা হত?

10. আরবের উন্নত অবস্থা কোন্ সময় থেকে আরম্ভ হল এবং কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল?

11. আরবীয়দের উন্নতির প্রবাহ কীভাবে বন্ধ হল?

11.4.3 সভ্যতা দেখতে পাই কালক্রমে . . . . . এবং সে দশার নাম হচ্ছে দূর্দশা।

শব্দার্থ ও টীকা

বক্তব্যসার:

আরবীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয় সভ্যতা উজ্জীবিত হল। তা উন্নতির চরম শিখরে উঠল। অথচ আরবে উন্নতির প্রবাহ বন্ধ হল। প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতা কিন্তু authoritarian অর্থাৎ স্বৈরতান্ত্রিক ছিল। অ্যারিস্টটলের ছিল অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের ওপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব। এখন ইউরোপীয়দের সেই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। এখন তারা তাদের সভ্যতা নিয়ে গর্বিত।

সার্বভৌম = সর্বাধিক।

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান দু'য়ে মিলে ছিল এক জাতি, এক প্রাণ, মহান ভারতীয় (জাতি)। কিন্তু বর্তমানে আমরা ভারতবাসীরা সে-কথা ভুলে পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত। এখন হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই নিজেদের বিভেদ ভুলে অগ্রসর হতে হবে। তাহলেই প্রকৃত জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব।

মন্তব্য:

প্রবন্ধটি ভারত বিভাগের পূর্ববর্তী সময়ের রচনা। ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালে দ্বিধাবিভক্ত হয়। জন্ম নেয় ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান। দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ। পাকিস্তান আবার ১৯৭১/৭২ সালে দ্বিখণ্ডিত হয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ। লেখক অবিভক্ত ভারতবর্ষের অগ্রগতির বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 11.3

সঠিক উত্তরটিতে (✓) চিহ্ন দিন ঃ—

1. ''ইউরোপের তামসিক যুগের অবসান হল।' —
   'তামসিক যুগ' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে —
   (i) সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে এমন যুগ।
   (ii) যে যুগে উন্নতির প্রবাহ বন্ধ হয়েছে এমন।
   (iii) অন্ধকার যুগ।
2. ''রোজই তাদের আত্মশক্তি বাড়ছে বই কমছে না।'' — 'আত্মশক্তি' বলতে বোঝায় —
   (i) নিত্যনতুন জিনিস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার শক্তি।
   (ii) নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা।
   (iii) নিজেদের সভ্যতার অগ্রগতির শক্তি।
3. ''ক্রমে তাদেরও বার্ধক্য উপস্থিত হল'' — এখানে 'বার্ধক্য উপস্থিত হল' বলতে বোঝান হয়েছে —
   (i) জীবনে জড়তা এসে পড়ল।
   (ii) সভ্যতার অগ্রগতির দ্বার রুদ্ধ হল।

শব্দার্থ ও টীকা

(iii) প্রাণহীন জীবন আরম্ভ হল।

4. '' অতীতের বোঝা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবার শক্তি কি আমাদের দেহে কখনোই জন্মাবে না।' অতীতের বোঝা বলতে এখানে বোঝান হয়েছে —
   (i) প্রাচীন প্রথার অনুসরণ।
   (ii) অবিরাম জীবন-সংগ্রামের ব্যর্থতার ভার।
   (iii) অতীতের পূর্বসূরিদের দুর্দশার ভার মোচন।

5. 'ইউরোপে তামসিক যুগের অবসান হল।' ইউরোপের 'তামসিক যুগ' বলতে কোন্ সময়ের কথা বলা হয়েছে?

6. 'ইউরোপের সৌভাগ্য যে, তাদের সে মনোভাব চলে গেছে।' এখানে 'সে মনোভাব' বলতে কোন্ মনোভাবের কথা বলা হয়েছে?

7. 'ভারতবর্ষ যে এই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত, তা নয়।" — 'প্রাকৃতিক নিয়ম' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

8. 'আমরা যেভাবে চলছি সেভাবে আর ক'দিন চলবে?" — 'আমরা যেভাবে চলছি' বলতে লেখক আমাদের কীভাবে চলার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন?

11.5 আপনি যা শিখলেন

1. বিভিন্ন জাতি একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করলে সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব।
2. প্রাচীন ভারতে একসময় সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছিল।
3. প্রাচীন ভারতে বৈদিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, পরবর্তী মধ্যযুগে মুসলিম এবং তারপরে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়।
4. ইউরোপে যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, ভারতে তখনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়নি। এখন ভারতে গণতান্ত্রিক (Democratic) ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে।
5. ভারতবর্ষে বর্তমানে সমস্ত সমস্যারই মীমাংসা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে।

11.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. ভারতের বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল, আলোচনা করুন।
2. ভারতবর্ষের যুগবৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লিখুন।
3. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ভারতে বর্তমানে কোন্ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে?
4. ''এর ফল যে বিষময় হচ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই।' — 'এর ফলে' বলতে কোন্ বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। কীভাবেই বা জীবন বিষময় হয়ে উঠছে — আলোচনা করুন।
5. ''অতীতের বোঝা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবার শক্তি কি আমাদের দেহে কখনোই জন্মাবে না?" — অতীতের বোঝা বলতে এখানে কোন্ ঐতিহাসিক সত্যের কথা বলা হয়েছে, আলোচনা করুন।

শব্দার্থ ও টীকা

11.8 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

11.1

1. ভারতবর্ষে বৈদিক যুগকে প্রাচীন যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে।
2. ভারতের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে — যথা (ক) প্রাচীন যুগ; (খ) মধ্যযুগ; (গ) আধুনিক যুগ।
3. সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধাই আমাদের দূরবস্থার প্রধান কারণ।
4. সত্যের প্রতি অনুসন্ধান করতে শেখা, তাকে নতশিরে মেনে নেওয়া এবং তার প্রচারের জন্য দৃঢ়সংকল্প হওয়া আমাদের উচিত। এই শিক্ষা আমাদের নেই। লেখক সেই অভাবজনিত কারণকেই ঐতিহাসিক 'কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন' বলেছেন।

11.2

1. না,
2. না,
3. হ্যাঁ,
4. হ্যাঁ,
5. হ্যাঁ,
6. গ্রিস উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল।
7. প্রাচীন আরবীয়রা মেষপালক বর্বর জাতি ছিল।
8. হজরত মোহাম্মদ মৃতপ্রায় আরবকে নবজীবন দান করেছিলেন।
9. 'আইয়ামে জাহেলিয়াৎ' — এর অর্থ অন্ধকার যুগ।
10. হজরতের সময় থেকে আরবের উন্নত অবস্থা শুরু হল। এই অবস্থা প্রায় চারশত বৎসর পর্যন্ত ছিল।
11. তারপর যখন তারা (আরবীয়রা) প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করতে শুরু করল তখন তাদের উন্নতির প্রবাহ বন্ধ হল।

11.3

1. (ii)
2. (ii)
3. (i)
4. (i)
5. আরবদের হাত থেকে ইউরোপীয়রা সভ্যতার পতাকা ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের সুসভ্য করে গড়ে তুলল। তাদের তামসিক যুগের অবসান হল।
6. ইউরোপের 'সে মনোভাব' বলতে ইউরোপের প্রাচীন authoritarian বা স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের কথা বলা হয়েছে। সেখানে রাজা যা বলত, তাই গ্রাহ্য হত। বিজ্ঞানের সত্যতা পুরোহিতদের খামখেয়ালের উপর নির্ভর করত। ইউরোপের সেই মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে।
7. পরিবর্তনশীলতাই হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম। জগৎ পরিবর্তনশীল। ভারতবাসীকে এ-সত্য মানতে হবে। প্রাচীন গৌরব নিয়ে গর্ব করলে চলবে না।
8. আমরা যেভাবে চলছি বলতে আমরা এখনও প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করে চলেছি। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই একাত্মতা ভুলে পৃথক পৃথকভাবে অতীতের অনুশীলন, অতীতের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

শব্দার্থ ও টীকা

জাগতিক উন্নতির কোনো প্রভাবই আমাদের উপর পড়ছে না। কাজে কাজেই আমরা নিজেদের কৃত দুর্দশার পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছি।

লেখক পরিচিতি

১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখে হুগলি জেলার বড়জাতপুর অঞ্চলে এস. ওয়াজেদ আলী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫১ সালের জুন মাসের ৬ তারিখে। কেমব্রিজ থেকে তিনি বি.এ. পাশ করেন। কর্মজীবনে তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সমকালীন মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত একজন লেখক হিসাবে তিনি প্রতিপত্তি লাভ করেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন। গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি, রম্যরচনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। 'মাশুকের দরবার', 'প্রেমের মুসাফির', 'ভারতবর্ষ', 'জীবনের শিল্প', 'খেয়ালের ফেরদৌস' প্রভৃতি প্রায় কুড়িটি গ্রন্থের তিনি লেখক। তাঁর লেখা প্রবন্ধ 'ভবিষ্যতের বাঙালী'। ইংরেজি ভাষাতেও তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

সমধর্মী রচনা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফরাসী মনীষী গিজো ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের আলোচনার যোগ্য। প্রথমে তাঁহার মত নিম্নে উদ্ধৃত করি।

''তিনি বলেন, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার পূর্ববর্তীকালে, কি এশিয়ায় কি অন্যত্র, এমনকি প্রাচীন গ্রিস-রোমেও, সভ্যতার মধ্যে একটি একমুখী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সভ্যতা যেন একটি মূল হইতে উঠিয়াছে এবং একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; সমাজের মধ্যে তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে, তাহার আচারে বিচারে, তাহার অবয়ব বিকাশে, সেই একটি স্থায়ী ভাবেরই কর্তৃত্ব দেখা যায়। যেমন, ইজিপ্টে এক পুরোহিত শাসনতন্ত্রে সমস্ত সমাজকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল; তাহার আচারব্যবহারে, তাহার কীর্তিস্তম্ভগুলি ইহারই একমাত্র প্রভাব। ভারতবর্ষেও এই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে সমস্ত সমাজকে একভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল।

''সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে ভিন্ন শক্তির বিরোধ উপস্থিত হয় নাই তাহা বলা যায় না, কিন্তু তাহারা সেই কর্তৃভাবের দ্বারা পরাস্ত হইয়াছে।

''এইরূপ এক ভাবের কর্তৃত্বে ভিন্ন দেশ ভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে। সমগ্র সমাজের মধ্যে এই ভাবের ঐক্যবশত গ্রিস অতি আশ্চর্য দ্রুতবেগে এক অপূর্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আর কোনো জাতিই এত অল্পকালের মধ্যে এমন উজ্জ্বলতা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু গ্রিস তাহার উন্নতির চরমে উঠিতে না উঠিতেই যেন জীর্ণ হইয়া পড়িল। তাহার অবনতিও বড়ো আকস্মিক। যে মূলভাবে গ্রিক সভ্যতায় প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল তাহা যেন রিক্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল; আর কোনো নূতন শক্তি আসিয়া তাহাকে বলদান বা তাহার স্থান অধিকার করিল না।

''অপরপক্ষে, ভারতবর্ষে ও ইজিপ্টেও সভ্যতার মূলভাব এক বটে, কিন্তু সমাজকে তাহা অচল করিয়া রাখিল; তাহার সরলতায় সমস্ত যেন একঘেয়ে হইয়া গেল। দেশ ধ্বংস হইল না, সমাজ টিকিয়া রহিল, কিন্তু কিছুই অগ্রসর হইল না, সমস্তই এক জায়গায় আসিয়া বন্ধ হইয়া গেল।''

ভাষা পাঠ

12. ভাষা পাঠ--- বাংলা শব্দভাণ্ডার
13. শব্দ গঠন
14. ভাষা রীতি
15. বাক্যের রূপান্তর

12

ভাষাপাঠ

বাংলা শব্দভাণ্ডার

12.1 প্রস্তাবনা

ভাষাপাঠ বলতে বোঝায় ভাষার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে পড়াশুনা। এই সব নিয়ম-কানুনের মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে ভাষায় যত শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলি কোথা থেকে এসেছে তার পরিচয় নিয়ে। বিষয়টি অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় বাংলা শব্দভাণ্ডারের উৎসগত শ্রেণিবিভাগ।

বংশধারার দিক থেকে বাংলা ভাষা ভারতীয় আর্য ভাষাবংশের সঙ্গে যুক্ত। এই ভাষাবংশের প্রাচীনতম ভাষারূপ পাওয়া যায় বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে। বৈদিক-সংস্কৃত ভাষা কালক্রমে পরিবর্তিত হতে হতে আধুনিক ভারতের অনেকগুলি ভাষার সৃষ্টি করেছে। বাংলা তাদের মধ্যে একটি। তবে বাংলা ভাষার উৎপত্তির মূলে সংস্কৃত ভাষা থাকলেও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর্যদের আসার আগে বাংলা দেশে বসবাসকারী কিছু প্রাক্-আর্য জাতির আদিবাসীদের ব্যবহৃত ভাষার শব্দ। এছাড়াও বহু বিদেশি ভাষার শব্দও বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে — বলায় ও লেখায়। এই সবটা নিয়েই বাংলার **শব্দভাণ্ডার**।

12.2 উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়লে করলে আপনি —

- বাংলা শব্দের উৎসগত শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বলতে ও জানাতে পারবেন;
- বাংলা শব্দের ভাণ্ডার যে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দে পূর্ণ সে বিষয় বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন;
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণির শব্দকে শনাক্ত করতে পারবেন;
- শনাক্ত করা বিভিন্ন শ্রেণির শব্দকে ঠিক ঠিক ভাবে বাক্যে ব্যবহার করতে পারবেন;
- বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ গ্রহণের ফলে বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা দেখাতে পারবেন;
- আলোচনার সময় কাজে লাগাতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা

12.3 বিষয়ের রূপরেখা

12.3.1 বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রাথমিক শ্রেণিবিভাগ

উৎস অনুযায়ী বাংলা ভাষার শব্দ প্রধানত চার শ্রেণিতে বিভক্ত — ১) মৌলিক ২) আগন্তুক ৩) সংকর বা মিশ্র দেশি শব্দ, ৪) দেশি শব্দ।

১) **মৌলিক শব্দ :** আগেই বলা হয়েছে বাংলা ভাষার উৎপত্তির মূলে একদিকে রয়েছে সংস্কৃত ও তার বিবর্তিত ভাষারূপ। এইগুলিই মৌলিক শব্দ। এই শব্দ তিন রকম : (ক) তৎসম, (খ) তদ্ভব, (গ) অর্ধতৎসম।

২) **আগন্তুক শব্দ :** বাংলা ভাষার উদ্ভবের পর বাংলা দেশের বাইরে থেকে আসা মানুষদের ভাষা থেকে যেসব শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে এসেছে সেগুলি আগন্তুক শব্দ। আগন্তুক শব্দ দুরকম : (১) বিদেশি (২) প্রতিবেশী

৩) **সংকর বা মিশ্র শব্দ :** বিভিন্ন শ্রেণির শব্দের মিশ্রণে তৈরি শব্দ।

৪) **দেশি শব্দ :** বাংলা ভাষায় এমন শব্দ আছে যারা কোথা থেকে এসেছে জানা যায় না। তাছাড়া প্রাচীনতম অধিবাসীদের ভাষা (যেমন - কোল, ভিল, সাঁওতালি ইত্যাদি) থেকে অনেক শব্দ এসেছে। এগুলি দেশি শব্দ।

12.3.2 মৌলিক শব্দ — (১) তৎসম শব্দ

তৎসম শব্দ : 'তৎ' এই সংস্কৃত শব্দটির অর্থ হল 'সেই'। তৎসম = তার সমান, সংস্কৃতের মতো।

সুতরাং বাংলা শব্দভাণ্ডারে যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ অপরিবর্তিত বা অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় এসেছে এবং এখনও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসছে, তাদের বলে তৎসম শব্দ।

যেমন, নদী, চন্দ্র, বায়ু, জল, কৃষ্ণ, বৃক্ষ, লতা, হস্ত, হস্তী, পক্ষী, অশ্ব, মাতা, পিতা, পুষ্প, শয্যা, অরণ্য, পৃথিবী, ধরিত্রী, কন্যা, প্রকৃতি, জীব, জন্তু, মৃত্যু, জন্ম, পদ, কষ্ট ইত্যাদি। এমন হাজার হাজার তৎসম শব্দ আমরা বাংলায় ব্যবহার করি।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.1

১. **নীচের শব্দগুলির মধ্যে যেগুলি তৎসম শব্দ তার পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন। যেগুলি তৎসম শব্দ নয়, তাতে (✗) চিহ্ন দিন :**

(i) বৃক্ষ — ( )
(ii) আজ — ( )
(iii) নক্ষত্র — ( )
(iv) পুত্র — ( )
(v) হাতি — ( )
(vi) চন্দ্র — ( )

12.3.3 অর্ধতৎসম শব্দ

কেষ্টা আয়রে কাছে।

শব্দার্থ ও টীকা

আজ বেস্পতিবার।

পুরুত চলেছেন পুজোয়।

কেষ্টা, বেস্পতিবার, পুরুত এই শব্দ তিনটির মূলে রয়েছে কৃষ্ণ/ বৃহস্পতিবার/ পুরোহিত, এই তিনটি তৎসম শব্দ। এমন বদল ঘটল কীভাবে? উচ্চারণের দোষে মূল সংস্কৃত শব্দের এমন বদল হয়েছে। এগুলো পুরো তৎসম নয়, আধা তৎসম শব্দ।

সুতরাং, যে সকল সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণের দোষে কিছুটা বিকৃত হয়ে বা রূপান্তরিত হয়ে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে জায়গা করে নিয়েছে, তাদের বলা হয় অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দ।

যেমন, জ্যোৎস্না > জোছনা; রৌদ্র > রোদ্দুর; ঘৃণা > ঘেন্না; সূর্য > সুজ্জি; মিত্র > মিত্তির; স্পর্শ > পরশ; প্রাণ > পরান; বৈদ্য > বদ্যি; শ্রী > ছিরি ইত্যাদি।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.2

1. নীচের শব্দগুলির মধ্যে যেগুলি অর্ধতৎসম তাতে টিক (✓) চিহ্ন এবং তৎসম শব্দে (✗) চিহ্ন দিন।

(i) বিদ্যে — ( )
(ii) বেস্পতি — ( )
(iii) গ্রাম — ( )
(iv) তৃষ্ণা — ( )
(v) মিথ্যে — ( )
(vi) বিচ্ছিরি — ( )

2. ঠিক উত্তরটির পাশে 'হ্যাঁ' এবং ভুল উত্তরে 'না' লিখুন ঃ

(a) অর্ধতৎসম শব্দ তৎসম শব্দেরই অন্যরূপ। ( )
(b) অর্ধতৎসম শব্দের উৎপত্তি হয় তাড়াতাড়ি উচ্চারণের ফলে। ( )
(c) তৎসম শব্দ থেকে অন্য পরিবর্তিত শব্দের মাধ্যমে অর্ধতৎসম শব্দের উৎপত্তি হয়। ( )

12.3.4 তদ্ভব

১ ২ ৩

কৃষ্ণ > কণ্হ > কানু

সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ

হস্ত > হত্থ > হাথ > হাত

সর্প > সপ্প > সাপ

উদাহরণের শব্দগুলো ১, ২, ৩ — এই তিনটি স্তরে সাজানো আছে। ১ নং স্তরের শব্দগুলো তৎসম। ২ নং স্তরের শব্দগুলো ১ নং স্তরের তৎসম শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু এগুলো এখন আমরা ব্যবহার করি না। ৩ নং স্তরের শব্দগুলো আমাদের খুবই পরিচিত। এগুলো আমরা ব্যবহার করি। এই ৩ নং স্তরের শব্দগুলো সংস্কৃত থেকে সরাসরি আসেনি। এসেছে পরবর্তী বংশধর হিসেবে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে। বংশধর হিসেবে তৎ (সংস্কৃত) থেকে এদের ভব (উদ্ভব বা জন্ম), এই জন্য এদের বলা হয় তদ্ভব শব্দ।

যেমন, হস্তী (সং) > হত্থী (প্রা) > হাতি (তদ্ভব/বাংলা)।

অলক্তক (সং) > অলত্তঅ (প্রা) > আলতা (তদ্ভব/বাংলা)।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.3

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন এবং ভুল উত্তরে (✗) দিন।

(i) তদ্ভব শব্দ থেকে তৎসম শব্দের উৎপত্তি — ( )

(ii) তৎসম থেকে তদ্ভব শব্দের উৎপত্তি — ( )

(iii) তদ্ভব আর বাংলা শব্দ একই — ( )

(iv) তদ্ভব শব্দ সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে — ( )

12.3.5 দেশি শব্দ

চিংড়ি মাছের মালাইকারি।

টঙে বসে আছ কেন?

ঢেউ খেলে যায় নদীর কূলে।

ঝাঁটা মেরে ধুলো ওড়াই।

গ্রাম্য বধূটি ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছেন।

এখানে চিংড়ি, টঙ, ঢেউ, ঝাঁটা, ঢেঁকি এ শব্দগুলো বাংলা ভাষায় যখন-তখনই ব্যবহার করি। এদের বলা হয় দেশি শব্দ।

টঙ্গ, টাক, খোকা, ঢ্যাঙা, কুড়ি, খুকি ইত্যাদি দেশি শব্দ।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.4

1. 'দেশি' শব্দে টিক (✓) চিহ্ন দিন এবং বাকিতে (✗) দিন :

(i) ঝাঁটা — ( )

(ii) গ্রাম — ( )

(iii) ডিঙি — ( )

(iv) জল — ( )

(v) ঢেঁকি — ( )

(vi) তেঁতুল — ( )

12.3.6 আগন্তুক শব্দ

বিদেশি শব্দ : আরবি, ফারসি, তুর্কি, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ইংরেজি, ফরাসি, চিনা, জাপানি, রুশ, বর্মি, গ্রিক, জার্মান, অস্ট্রেলীয়, স্পেনীয়, ব্রহ্মদেশীয়, মালয়ী, ইতালীয় ইত্যাদি।

উদাহরণ :

বাজারে আজ অনেক মাছ।

স্টেশনে দাঁড়িয়েই রইলাম।

শব্দার্থ ও টীকা

পেয়ারাটা বেশি পাকা।

কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি।

নীচে দাগ দেওয়া শব্দগুলি আমরা অর্থাৎ বাঙালিরা প্রায়ই ব্যবহার করি বলায় এবং লেখায়। বাংলা অক্ষরে লিখি বলে মনে হয় এগুলি বাংলার নিজস্ব শব্দ। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষা থেকে ধার করা। সেজন্য এ শব্দগুলিকে **বিদেশি শব্দ** বলা হয়।

সুতরাং, ভারতবর্ষের বাইরের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার বহু শব্দ সোজাসুজি বা কিছুটা বিকৃত করে বাংলায় ব্যবহৃত হয় বলে এদের **বিদেশি শব্দ** বলা হয়।

যেমন : ইস্টিশন (station), হাসপাতাল (hospital), দরদ (দর্দ), ডাক্তার (doctor), রেস্তোরাঁ (restaurant), হাকিম ইত্যাদি।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.5

1. শূন্যস্থানে ঠিক উত্তরটি বসান : (ডানদিক থেকে বেছে নিয়ে)

(i) বিদেশি শব্দ _____ শব্দের মধ্যে পড়ে। (তৎসম, আগন্তুক, তদ্ভব)

2. বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিক মেলান মাঝখানের ফাঁকে ডানদিকের উত্তরের ঠিক সংখ্যা বসিয়ে :

A	উত্তরের সংখ্যা	B
(a) বাংলায় বিদেশি শব্দ এসেছে — _____		(i) বাংলা অক্ষরে
(b) বাংলায় বিদেশি শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে — _____		(ii) আর্যদের এদেশে আসার অনেক পরে।
(c) ইংরেজি শব্দ বাংলা লেখায় ব্যবহৃত হয় — _____		(iii) ভারতের বাইরের দেশ থেকে।

12.3.7 প্রতিবেশী শব্দ।

আমার কোনো চাহিদা নেই।

শিবুর কথা বোলো না, ও একটা ফালতু লোক।

কাল নাকি হরতাল?

আমরা প্রায়ই এ শব্দগুলো বাংলা শব্দ ভেবে বাংলায় ব্যবহার করি। আসলে এরা বাংলার বাইরের বিভিন্ন রাজ্যের শব্দ। যেমন, চাহিদা - পাঞ্জাবি শব্দ, ফালতু - হিন্দি শব্দ, হরতাল - গুজরাটি শব্দ। এমনি কথাবার্তায়, এমনকি লেখায়ও বাঙালিরা বাংলার বাইরের ভিনরাজ্যে ব্যবহৃত ভাষার অনেক শব্দ বলে থাকে।

প্রতিশব্দের আরও উদাহরণ :

হিন্দি শব্দ = ইস্তক, পুরি, কচুরি, খাটা, খানা, লাগাতার, আপস, চানাচুর, বন্ধ, ঝান্ডা, টহল, দাঙ্গা, তাগড়া, ডেরা, বেলচা, লাগাতার, চামেলি, ঝাড়ু, লোহা ইত্যাদি।

শব্দার্থ ও টীকা

গুজরাটি শব্দ = খাদি, গরবা, তকলি ইত্যাদি।

পাঞ্জাবি শব্দ = শিখ, ধাবা ইত্যাদি।

মারাঠি শব্দ = চৌথ, বর্গি, পাটিল, কুলকার্নি ইত্যাদি।

তামিল শব্দ = চুরুট, পিলে (ছেলেপিলে), খোকা, খুকু ইত্যাদি।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.6

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন এবং ঠিক না হলে (✗) দিন।

(i) ভিনপ্রদেশের মানুষের ব্যবহৃত শব্দ বাঙালি গ্রহণ করেছে। — ( )

(ii) 'চাহিদা' শব্দটি হিন্দি শব্দ — ( )

(iii) অন্য যে কোনো ভারতীয় শব্দকেই দেশি শব্দ বলা যায় — ( )

(iv) 'কাহিনি' শব্দটি বাংলা শব্দ নয় — ( )

2. নীচের প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে লিখুন :

(a) 'আগন্তুক শব্দ' বলতে কী বোঝায়?

(b) সাধারণত কোন্ কোন্ ভাষার বেশি শব্দ বাংলায় এসেছে?

(c) আগন্তুক শব্দ হিসেবে ভারতের বাইরের দেশের এবং ভারতের অভ্যন্তরের রাজ্যে ব্যবহৃত শব্দের পার্থক্য কী?

(d) বাংলা এবং ভারতের অন্য রাজ্যের ভাষার লেনদেনের ফল কী হয়েছে?

12.3.7 সংকর বা মিশ্র শব্দ :

কাজ-কারবারে মন্দা চলছে এখন।

স্কুলশিক্ষককে সকলেই সম্মান করে।

ডাক্তারবাবু রোগী দেখছেন।

দেখা যাচ্ছে একাধিক শব্দ মিলে একশব্দে ব্যবহৃত হয়েছে তিনটি বাক্যে।

কাজ-কারবার — কাজ (তদ্ভব শব্দ), কারবার (বিদেশি শব্দ);

স্কুলশিক্ষক — স্কুল (বিদেশি শব্দ), শিক্ষক (তৎসম শব্দ);

ডাক্তারবাবু — ডাক্তার (বিদেশি শব্দের বিকৃত রূপ), বাবু (দেশি) — এভাবে শব্দগুলি মিলে গিয়ে একটি শব্দে পরিণত হবার ফলে এদের বলা হয় **সংকর** বা **মিশ্র শব্দ**।

সুতরাং তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের একের সঙ্গে অন্য শব্দের কিংবা এক শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে যে শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলে **সংকর** বা **মিশ্র শব্দ**। যেমন, **বাবুগিরি** — বাবু (দেশি) + গিরি (বিদেশি প্রত্যয়); **বে-হাত** — বে (বিদেশি উপসর্গ) + হাত (তদ্ভব) ইত্যাদি।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 12.7

1. শূন্যস্থানে ঠিক উত্তরটি বসান : (ডানদিকের বন্ধনী থেকে)

(i) সংকর শব্দ বাংলা ভাষার _____ তৈরি শব্দ। (নিজের/ ধার করা/ কিনে আনা।)

(ii) সংকর শব্দ আর আগন্তুক শব্দ _____ শব্দ নয়। (বিদেশি শব্দ/ একজাতীয়/ ইংরেজি শব্দ)

(iii) 'ডাক্তারবাবু' হল _____ শব্দ। (বিদেশি শব্দ/ মিশ্র শব্দ/ ইংরেজি শব্দ)

(iv) সংকর শব্দ ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষা _____ হয়েছে। (দুর্বল/ সমৃদ্ধ/ ক্ষতিগ্রস্ত)

12.4 আপনি যা শিখলেন

(i) সংস্কৃত ভাষা বাংলার আদি ভাষা, প্রতিবেশি রাজ্যের ভাষা, বিদেশিভাষা— এ সব রকম ভাষা মিয়ে তৈরি হয়েছে বাংলা শব্দ ভাণ্ডার।

(ii) বাংলা ভাষায় যোগ হয়েছে দেশ-বিদেশের বহু শব্দ।

(iii) বাংলা ভাষা অন্য ভাষার শব্দগ্রহণের ফলে সেই সেই দেশের মানুষের সঙ্গে মনের যোগ তৈরি হয়েছে।

(iv) অন্য ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার লেনদেনের ফলে অন্য দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে।

(v) বিভিন্ন দেশের মানুষের ব্যবহৃত শব্দ গ্রহণের ফলে বাংলার শব্দভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছে।

(vi) বাংলা ভাষা অন্য দেশের ভাষাকে গ্রহণ করে একেবারে নিজের করে নিয়েছে।

12.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

1. বাংলা শব্দভাণ্ডারে উৎসবিচারে কতরকমের শব্দ আছে? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দিন।

2. উদাহরণসহ নীচের বিষয়গুলির পার্থক্য দেখান :

(a) তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দ;

(b) তৎসম ও তদ্ভব শব্দ;

(c) মৌলিক ও আগন্তুক শব্দ;

(d) দেশি ও বিদেশি শব্দ;

(e) তদ্ভব ও দেশি শব্দ।

3. সংকর শব্দের অর্থ কী? এ জাতীয় শব্দ কীভাবে তৈরি হয়েছে? দুটি উদাহরণ দিন।

4. সাধারণত কোন্ কোন্ অ-বাংলা ভারতীয় শব্দ বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে? এর ফলে কী হয়েছে?

শব্দার্থ ও টীকা

5. বিদেশি শব্দ গ্রহণ করার ফলে বাংলা ভাষা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে কি? এর পক্ষে বা বিপক্ষে আপনার মতামত দিন।

6. নীচের শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলায় প্রচলিত আগন্তুক শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করুন।
পেয়ালা, কেদারা, ছবি, লেখনী, আদেশ।

7. নিজের তৈরি দশটি বিভিন্ন শ্রেণির একটি তালিকা তৈরি করুন:

12.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

12.1

1. (i) ✓ (ii) ✗ (iii) ✓ (iv) ✓ (v) ✗ (vi) ✓

12.2

1. (i) ✓ (ii) ✓ (iii) ✗ (iv) ✗ (v) ✓ (vi) ✓
2. (a) না; (b) হ্যাঁ; (c) না।

12.3

1. (i) ✗ (ii) ✓ (iii) ✓ (iv) ✗

12.4

1. (i) ✓ (ii) ✗ (iii) ✓ (iv) ✗ (v) ✓ (vi) ✓

12.5

1. (i) আগন্তুক (ii) বিচার ও শাসনব্যবস্থা (iii) গ্রিক (iv) পোর্তুগিজ।
2. (a) (iv) (b) (iii) (c) (ii) (d) বাংলা অক্ষরে।

12.6

1. (i) ✗ (ii) ✗ (iii) ✗ (iv) ✓
2. (a) যে শব্দ বাংলার বাইরের অন্য রাজ্য থেকে বা ভারতের বাইরের অন্য দেশ থেকে বাংলা ভাষায় মিশে গেছে তাকে বলে আগন্তুক শব্দ।
   (b) সাধারণত হিন্দি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, মারাঠি, তামিল ইত্যাদি শব্দ বাংলায় এসেছে।
   (c) ভারতের বাইরের দেশের শব্দ সম্পূর্ণভাবে বিদেশি শব্দ আর ভারতের অন্য রাজ্যের ভাষা বাংলা না হলেও আমাদের দেশ ভারতবর্ষের ভাষা।
   (d) বাংলার সঙ্গে ভারতের অন্য ভাষার মিলনের ফলে একদিকে যেমন অন্য রাজ্যের মানুষের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক মিলনও ঘটেছে।

12.7

1. (i) নিজের; (ii) একজাতীয়; (iii) মিশ্রশব্দ; (iv) সমৃদ্ধ।

13

শব্দগঠন

(ক. প্রত্যয় যোগে খ. সমাস যোগে)

13.1 প্রস্তাবনা

আগের অধ্যায়ে আপনারা জেনেছেন বাংলা ভাষায় যত শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলো এসেছে নানা উৎস থেকে। এবার কি জানতে ইচ্ছা হয় না যে শব্দ তৈরি হয় কীভাবে? তারও জবাব ভাষার পণ্ডিতেরা দিয়েছেন। কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক :

(১) চলন্ত ট্রেনে ডাকাতি হয়েছে।

(২) ডাকাতদল যাত্রীদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়েছে।

১ নং উদাহরণে দুটি শব্দ আছে — 'চলন্ত' ও 'ডাকাতি', এবং ২ নং উদাহরণেও দুটি শব্দ আছে — 'ডাকাতদল' ও 'আগ্নেয়াস্ত্র'। কিন্তু দুই উদাহরণে শব্দগুলো একভাবে তৈরি হয়নি। ১ নং উদাহরণে 'চল্' ধাতুর সঙ্গে 'অন্ত' এই চিহ্ন যোগ করে 'চলন্ত' এবং 'ডাকাত' শব্দের সঙ্গে 'ই' - এই চিহ্ন যোগ করে শব্দ দুটি তৈরি হয়েছে। কিন্তু ২ নং উদাহরণের দুটি শব্দের মধ্যেই দুটো করে শব্দ একত্রে জুড়ে গিয়েছে : ডাকাত + দল। আগ্নেয় + অস্ত্র। এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায় শব্দ তৈরি হয় দুভাবে। (১) ধাতু ও শব্দের সঙ্গে চিহ্ন যোগ করে ও (২) দুই বা তার বেশি শব্দকে একত্র জুড়ে দিয়ে। শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে যে চিহ্ন যোগ করে শব্দ তৈরি হয় তাকে বলে প্রত্যয়। প্রত্যয় শব্দের অর্থ বিশ্বাস, ধারণা বা বোধ। এই ধরনের চিহ্ন ধাতু বা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দগঠনের মাধ্যমে একটা ধারণা বা বোধ তৈরি করে বলে এই ধরণের চিহ্নকে বলে প্রত্যয়। আর **২ নং উদাহরণে** একাধিক শব্দকে ছোটো করে একটা শব্দে পরিণত করা হয়েছে। ছড়িয়ে-থাকা কথাকে ছোট্ট একটা কথায় রূপ দেওয়াকে ভাষার পণ্ডিতেরা বলেছেন সমাস। কারণ 'সমাস' শব্দের অর্থ হচ্ছে ছোট্ট করে গুটিয়ে আনা। [সমাস = সম্ (সংহতভাবে) + আস (থাকা)।]

13.2 উদ্দেশ্য

আপনি এই পাঠটি পড়লে—

- বাংলা শব্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে প্রত্যয়ের ভূমিকা সম্বন্ধে জানতে পারবেন;
- ধাতু ও শব্দের শেষে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করে নতুন শব্দ তৈরি করতে পারবেন;

শব্দার্থ ও টীকা

- শব্দ ভেঙে প্রত্যয় (বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি) আলাদা করতে পারবেন;
- শব্দ ভেঙে কোন্‌টি কী জাতীয় প্রত্যয় তা শনাক্ত করতে পারবেন;
- বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সমাসের ভূমিকা সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারবেন;
- সমাসবদ্ধ শব্দকে ভেঙে ব্যাসবাক্য নির্ণয় করতে পারবেন;
- নিজে সমাসবদ্ধ শব্দ তৈরি করে নিজের রচনাকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

13.3 বিষয়ের রূপরেখা

13.3.1 প্রত্যয় যোগে শব্দগঠন

দুটি উদাহরণ নেওয়া যাক —

ক) অঙ্কুরিত বীজই গাছ তৈরি করে।

খ) চলন্ত ট্রেন থেকে নেমো না।

ক) এখানে 'অঙ্কুরিত' শব্দটিকে ভাঙলে হয় — অঙ্কুর + ইত। 'অঙ্কুর শব্দটি একটি বিশেষ্য পদ। এর সঙ্গে 'ইত' (বর্ণসমষ্টি) যোগ হয়ে তৈরি হল 'অঙ্কুরিত'। এটি বিশেষণ পদ। 'ইত' শব্দটি হল শব্দ প্রত্যয় বা তদ্ধিত প্রত্যয়। আর 'অঙ্কুরিত' শব্দটি হল তদ্ধিতান্ত শব্দ।

তেমনি, নীল (বিশেষ্যপদ) + ইমা = নীলিমা। এটিও তদ্ধিতান্ত শব্দ, কিন্তু এটি বিশেষ্য হয়েছে।

খ) চলন্ত = চল্ + অন্ত। 'চল্' ধাতুর সঙ্গে 'অন্ত' বর্ণসমষ্টি যোগ হয়ে নতুন শব্দ 'চলন্ত' শব্দটি তৈরি হয়েছে। ধাতুর সঙ্গে হয়েছে বলে একে বলে ধাতু বা কৃৎ প্রত্যয় এবং 'চলন্ত' শব্দটি হল কৃদন্ত শব্দ। এটি বিশেষণের কাজ করছে। ধাতু-প্রত্যয় থেকে বিশেষ্যও তৈরি হতে পারে। যেমন, শী + অন = শয়ন (বিশেষ্য); শম্ + তি = শান্তি, কাঁপ্ + উনি = কাঁপুনি ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় এভাবে বহু শব্দ তৈরি হয়েছে এবং সেগুলি বলে বা লিখে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দকে ভাঙলে প্রথমে যে অংশটি পাওয়া যাবে, সেটি হয় নামপদ (বিশেষ্য ইত্যাদি) অথবা ধাতু (ক্রিয়ার মূল)। দ্বিতীয় অংশটি (বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি) হল প্রত্যয়। ভাঙা শব্দের প্রথম অংশ ধরেই প্রত্যয়ের নামকরণ — প্রথমে শব্দ থাকলে শব্দ বা তদ্ধিত প্রত্যয় এবং প্রথমে ধাতু থাকলে ধাতু বা কৃৎ প্রত্যয় হয়। এভাবেই প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদ গঠন করতে হয়। আবার প্রত্যয়ের ঠিক পরিচয় জানবার জন্যে নতুন শব্দটিকে ভেঙে দেখাতে হয়।

১। নীচে বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় দেওয়া হল; এগুলো নিয়ে কীভাবে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে তাও দেখানো হল। মনে রাখতে হবে, ওগুলি শব্দের সঙ্গে বসানো হলে শব্দ প্রত্যয় এবং ধাতুর সঙ্গে বসানো হলে ধাতু প্রত্যয় হয়েছে।

(ক) কৃৎ বা ধাতু প্রত্যয় : (ধাতুর চিহ্ন = √)

আন > √শী + আন = শয়ন;

মান > √সেব্ + মান = সেবমান;

তা > √দা + তা = দাতা; ইষ্ণু > √বৃধ্ + ইষ্ণু = বর্ধিষ্ণু;

অন > √চল্ + অন = চলন; তি > √দৃশ্ + তি = দৃষ্টি;

অণীয় > √কৃ + অণীয় = করণীয়; য্ > √দা + য্ = দেয়;

অক > √পচ্ + অক = পাচক; অ > √ঝুল্ + অ = ঝুল;

অত > √ফির্ + অত = ফিরত/ফেরত;

অন্ত > √জীব্ + অন্ত = জীবন্ত;

আন > √জানা + আন = জানান (জানানো);

উনি > √ঝাঁক্ + উনি = ঝাঁকুনি; ইয়ে > √নাচ্ + ইয়ে = নাচিয়ে; উক > √মিশ্ + উক = মিশুক; উয়া > √পড়্ + উয়া = পড়ুয়া।

মন্ > √জন্ + মন্ = জন্ম; √ধৃ + মন্ = ধর্ম

অ > √গ্রহ্ + অ = গ্রহ; √ত্যজ্ + অ = ত্যাগ

অ > পরি + √ত্যজ্ + অ = পরিত্যাগ

র > √চন্দ্ + র = চন্দ্র; য > √সৃ + য = সূর্য

অন > √গম্ + অন = গমন

ত > যথা + √বচ্ + ত = যথোক্ত (যথা+উক্ত)

উ > √বন্ধ্ + উ = বন্ধু;

ইতে > √কর্ + ইতে = করিতে

(খ) তদ্ধিত বা শব্দ প্রত্যয় :

অ > মনু + অ = মানব; পাণ্ডু + অ = পাণ্ডব; পৃথিবী+অ= পার্থিব;

য > দিতি + য = দৈত্য; বিচিত্র + য = বৈচিত্র্য;
পণ্ডিত + য = পাণ্ডিত্য

ই > রাবণ + ই = রাবণি; সুমিত্রা + ই = সৌমিত্রি

এয় > গঙ্গা + এয় = গাঙ্গেয়; অগ্নি + এয় = আগ্নেয়;

আয়ন > নার + আয়ন = নারায়ণ; রাম + আয়ন = রামায়ণ;
দ্বীপ + আয়ন = দ্বৈপায়ন;

ঈয় > ভারত + ঈয় = ভারতীয়; দেশ + ঈয় = দেশীয়;

ইক > ইতিহাস + ইক = ঐতিহাসিক; শরীর + ইক = শারীরিক

ইত > পুষ্প + ইত = পুষ্পিত; পিপাসা + ইত = পিপাসিত

ইন্ > সুখ + ইন্ = সুখী; রথ + ইন্ = রথী

ঈন > কুল + ঈন = কুলীন; গ্রাম + ঈন্ = গ্রামীন

বিন্ > মেধা + বিন্ = মেধাবী; তেজস্ (তেজঃ) + বিন্ = তেজস্বী।

ময় > মৃৎ + ময় = মৃণ্ময়; জল + ময় = জলময়।

মান/বান > শ্রী + মান = শ্রীমান; জ্ঞান + বান = জ্ঞানবান।

ইন্ > ঐশ্বর্যশাল + ইন্ = ঐশ্বর্যশালী;

ইয় > অঙ্গুরি + ইয় = অঙ্গুরীয়

অ > সহস্ (বল বা তেজ) + অ = সাহস

ইক > অন্তর + ইক = আন্তরিক

ইমা > গুরু + ইমা = গরিমা; রক্ত + ইমা = রক্তিমা।

ল > মাংস + ল = মাংসল; শ্যাম + ল = শ্যামল।

আমি/মি/মো/আমো > জেঠা + আমি = জেঠামি।

ই > মাস্টার + ই = মাস্টারি; দালাল + ই = দালালি।

ইয়া (এ) > জোগাড় + ইয়া = জোগাড়ে; মাটি + ইয়া = মেটে।

উয়া (ও) > মাছ + উয়া = মেছো; বন + উয়া = বুনো।

উক > ভাব + উক = ভাবুক; লাজ + উক = লাজুক।

টিয়া (টে) > ভাড়া + টিয়া = ভাড়াটে; ঝগড়া + টিয়া = ঝগড়াটে।

পানা/পারা > চাঁদ + পানা = চাঁদপানা; পাগল + পারা = পাগলপারা।

আই > কান + আই = কানাই; খাড়া + আই = খাড়াই।

মন্ত/ বন্ত > ভাগ্য + বন্ত = ভাগ্যবন্ত; শ্রী + মন্ত = শ্রীমন্ত।

পনা > গিন্নি + পনা = গিন্নিপনা; দুরন্ত + পনা = দূরন্তপনা।

(গ) বিদেশি প্রত্যয়

আনা > বিবি + আনা = বিবিয়ানা; মালিক + আনা = মালিকানা
আনি > বাবু + আনি = বাবুয়ানি।

ওয়ান > দ্বার + ওয়ান = দারোয়ান; কোচ + ওয়ান = কোচোয়ান।
গর > জাদু + গর = জাদুগর; কারি + গর = কারিগর।
খোর > নেশা + খোর = নেশাখোর; গাঁজা + খোর = গাঁজাখোর।

চি > কলম + চি = কলমচি; তবল + চি = তবলচি।

দান/দানি > কলম + দান = কলমদান; ধূপ + দানি = ধূপদানি।

দার > খবর + দার = খবরদার; দোকান + দার = দোকানদার।

গিরি > কেরানি + গিরি = কেরানিগিরি; বাবু + গিরি = বাবুগিরি।

নবিশ > শিক্ষা + নবিশ = শিক্ষানবিশ; পত্র + নবিশ = পত্রনবিশ।

সই > প্রমাণ + সই = প্রমাণসই; মানান + সই = মানানসই

ইত্যাদি।

পাঠগত প্রশ্ন : 9.3

1. নীচে শব্দ ও প্রত্যয় দেওয়া আছে। দুটো যোগ করে শব্দ গঠন করুন:

(i) রাম + আয়ন = (ii) বিচিত্র + য় = (iii) জাতি + ঈয় =

(iv) কলুষ + ইত = (v) সুখ + ইন্ = (vi) সুখ + ময় =

(vii) কীর্তি + মান = (viii) ধন + বান = (ix) মানব + ইক =

2. ধাতু ও প্রত্যয় দেওয়া হল। দুটো যোগ করে শব্দ গঠন করুন:

(i) চল্ + অন্ত = (ii) দৃশ্ + তি = (iii) কৃ + তব্য =

(iv) গম্ + অন = (v) বন্ধ্ + উ = (vi) পড়্ + উয়া =

(vii) পঠ্ + ইত = (viii) ঝাঁক্ + উনি = (ix) দা + তা =

3. নীচের বাক্যের প্রত্যয়যুক্ত শব্দগুলি বেছে নিন:

(i) তাঁর পাণ্ডিত্য সকলেই জানে।

(ii) দিল্লিতে দ্রষ্টব্য অনেক কিছুই আছে।

(iii) বর্ষায় হল কর্ষণ হয়।

(iv) তোমার মতো বিত্তবান কজন আর আছে।

(v) অনেকে এই মাসিক পত্রিকার পাঠক।

(vi) চিত্রল হরিণ আরণ্যক প্রাণী।

13.3.2 সমাস যোগে শব্দগঠন :

এই বিদ্যালয় বহু প্রাচীন।

গাছপাকা আম খেতে ভারী মজা।

দাগ দেওয়া শব্দ দুটি 'বিদ্যালয়' এবং 'গাছপাকা'কে একটি করে শব্দ মনে হলেও আসলে এরা দুটি করে শব্দের মিলনে তৈরি হয়েছে। শব্দ দুটি ভাঙলে এমনি হয় — বিদ্যার যে আলয় এবং গাছে পাকা। শব্দগুলি যথাক্রমে হল - 'বিদ্যা ও আলয়' এবং 'গাছ ও পাকা'। দুটি করে শব্দ মিশে একটি শব্দে পরিণত হওয়ার এই নিয়মকে বলে **সমাস**। 'সমাস' কথার অর্থ হল 'সংক্ষেপ করা'।

কিন্তু একটি কথা, যে কোনো দুটি শব্দের মিলনেই সমাস হয় না। পাশাপাশি শব্দ-দুটির মধ্যে সম্পর্ক থাকতে হবে এবং শব্দ দুটির অর্থ থাকতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক — শিবনাথ ঘরে নেই। এখানে

শব্দার্থ ও টীকা

'শিবনাথ' এবং 'ঘর' শব্দ দুটির অর্থ আছে আর এরা পাশাপাশি বসেছেও। কিন্তু এদের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। এ শব্দ দুটিকে মিলিয়ে যদি বলা হয় 'শিবনাথঘর', তাহলে কোনো মানেই হয় না। অতএব এটি কোনো অবস্থাতেই সমাসবদ্ধ পদ নয়।

সুতরাং পরস্পর অর্থসহ সম্বন্ধযুক্ত দুই বা তার বেশি পদের মিলনে গঠিত একপদের নাম হল সমাস।

আবার, 'বিলেতফেরত' এই সমাসবদ্ধ পদটিকে ভেঙে দেখালে এমনি হয় — 'বিলেত থেকে ফেরত'। 'থেকে' বলে একটি বাড়তি শব্দ এনে শব্দ দুটির মিলন ঘটানো হয়েছে। এই ভেঙে দেখানো প্রক্রিয়াকে বলা হয় ব্যাসবাক্য। যে পদ দুটি নিয়ে সমাস তৈরি হল, তাদের বলে সমাসবদ্ধ পদ। এখানে বিলেত - পূর্বপদ এবং ফেরত - পরপদ হল সমস্যমান পদ (যে পদগুলি নিয়ে সমাস তৈরি হয়) আর দুটি পদের মিলিত রূপ অর্থাৎ 'বিলাত-ফেরত' পদটি হল সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ।

সমাস প্রধানত পাঁচ রকমের হতে পারে। যেমন, (১) কর্মধারয়, (২) তৎপুরুষ, (৩) দ্বন্দ্ব, (৪) বহুব্রীহি ও (৫) দ্বিগু। এদের আবার নানা উপবিভাগ আছে। বর্তমানে অত বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। বিশেষভাবে সমাসের নামের উল্লেখেরও প্রয়োজন নেই। সাহিত্যপাঠের সময়ে সমাসবদ্ধ পদের দেখা মিললে স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে — কোন্ কোন্ শব্দের মিলনে এবং কীভাবে (অর্থাৎ ব্যাসবাক্য) তৈরি হয়েছে। এই জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্য সমস্তরকম সমাসেরই কিছু কিছু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে তুলে ধরা হচ্ছে। এতে প্রয়োজনে আপনারা সমাস সম্বন্ধে কৌতূহল মেটাতে পারবেন এবং নিজেরাই সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য তৈরি করতে এবং সম্বন্ধযুক্ত দুটি বা তার বেশি পদের মিলন ঘটিয়ে সমাস তৈরি করতে পারবেন।

A . বিভিন্ন সমাসের উদাহরণ দেওয়া হল ব্যাসবাক্য করে :

1) নীল যে কমল = নীলকমল।
2) যা কাঁচা তাই মিঠে = কাঁচামিঠে।
3) কাজলের ন্যায় কালো = কাজলকালো।
4) মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র
5) প্রাণরূপ পাখি = প্রাণপাখি
6) কীর্তি প্রকাশক মন্দির = কীর্তিমন্দির
7) বীজকে বোনা = বীজবোনা
8) দা দিয়ে কাটা = দা-কাটা
9) রান্নার নিমিত্ত (জন্য) ঘর = রান্নাঘর
10) লোক থেকে লজ্জা = লোকলজ্জা
11) বিশ্বের স্রষ্টা = বিশ্বস্রষ্টা
12) জগতে বিখ্যাত = জগৎবিখ্যাত
13) অ (নয়) সুস্থ = অসুস্থ
14) মধুপান করে যে = মধুপ
15) জীবন পর্যন্ত = আজীবন

শব্দার্থ ও টীকা

16) আধ (অর্ধ) ভাবে ময়লা = আধময়লা

17) মানবকে অতিক্রম করে যে = অতিমানব

18) সত্য বলে যে = সত্যবাদী

19) মড়ার জন্য কান্না = মড়াকান্না

20) যন্ত্র দ্বারা পরিচালিত = যন্ত্রচালিত

21) মা ও বাবা = মা-বাবা

22) পীত অম্বর (কাপড়) যার = পীতাম্বর

23) চৌ (চার) রাস্তার সমাহার (মিলন) = চৌরাস্তা

24) অন্য ভাষা = ভাষান্তর

25) তেল দিয়ে ভাজা = তেলেভাজা

13.4 আপনি যা শিখলেন

(i) শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে বর্ণ (চিহ্ন) যোগ করে যে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলে প্রত্যয়;

(ii) শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে হয় শব্দপ্রত্যয়, আর ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে হয় ধাতু প্রত্যয়;

(iii) প্রত্যয় দিয়ে শব্দ তৈরি হবার ফলে মূল শব্দ বা ধাতুর চেহারার বদল হয়;

(iv) শব্দ ভেঙে প্রত্যয় আলাদা করার রীতি প্রকৃতি;

(v) প্রত্যয়যুক্ত শব্দকে বাক্যে ব্যবহারের নিয়ম;

(vi) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদের মিলনের নাম হল সমাস;

(vii) সমাসবদ্ধ পদকে ভেঙে দেখানোকে বলা হয় ব্যাসবাক্য;

(viii) যে পদগুলি দিয়ে সমাস হয়, তাদের বলে সমস্যমান পদ;

(ix) বাক্যে সমাসবদ্ধ পদ একদিকে যেমন বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে, অন্যদিকে তা বাক্যের সৌন্দর্য বাড়াতেও সাহায্য করে;

(x) ব্যাসবাক্য সহ সমাস করার নিয়ম;

(xi) বাক্যে সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার করতে।

শব্দার্থ ও টীকা

13.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

A.

1. প্রত্যয় কাকে বলে? কত রকমের ও কী কী? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

2. কৃৎ প্রত্যয় থেকে উৎপন্ন শব্দকে কী বলে? তদ্ধিত প্রত্যয় থেকে নিষ্পন্ন শব্দকে কী বলে? প্রত্যেকটির দুটি করে উদাহরণ দিন।

3. পদ গঠনে প্রত্যয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (৫-৬টি বাক্যে)

4. নীচের প্রত্যয়গুলি দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করুন :

আমি, অন, টে, আই, অন্ত, এয়, ইত, এ, ওয়ালা, টন, খানা, দার, খোর।

5. প্রত্যয় ভেঙে দেখান :

a) জ্ঞাতি — ..... + ...

b) দেহখানা— ..... + ...

c) দৃশ্যমান — ..... + ...

d) খানিক — ..... + ...

e) গ্রাম্য — ..... + ...

f) ক্রুদ্ধ — ..... + ...

g) মুখর — ..... + ...

h) দারিদ্র্য — ..... + ...

i) কর্তব্য — ..... + ...

j) আদেশ — ..... + ...

k) গ্রহণ — ..... + ...

l) খেলোয়াড় — ..... + ...

m) দারোয়ান — ..... + ...

n) ঢাকাই — ..... + ...

6. প্রত্যয় নির্ণয় করুন : (শুধু প্রত্যয়ের নাম উল্লেখ করবেন)

তৃপ্ত, বাস্তবিক, দৈব, পাক্ষিক, পূজনীয়, কৃত।

শব্দার্থ ও টীকা

B. নীচে কয়েকটি সমাসের ব্যাসবাক্য করে দেওয়া হল। এদের সমাসবদ্ধ করুন:

1. নীল যে কমল =

2. শৈশব পর্যন্ত =

3. বৌ ভাত দেয় যে অনুষ্ঠানে =

4. পুত্রের সঙ্গে বর্তমান =

5. মাজা ও ঘষা =

6. জন্ম পর্যন্ত =

7. মানব রূপে জন্ম =

8. অন্য মন যার =

9. নিঃ (নেই) তরঙ্গ যার =

10. অন (নয়) আচার =

11. ইষ্টকে অতিক্রম না করে =

12. ময়ূরের কণ্ঠের মতো বর্ণ যার =

13. কীর্তির কলাপ (সমূহ) =

14. পুত্রের বধূ =

15. সুভাষ নামে কাকা =

16. দ্বৈধ যে মত =

17. বে (নেই) আন্দাজ =

18. কৌতূহল আছে যার =

19. বাক্যের অর্থ =

20. লোকের দ্বারা গড়ে ওঠা অরণ্য =

C. ব্যাসবাক্য করে সমাস নির্ণয় করুন :

অশ্রদ্ধেয়, গণিতশাস্ত্র, পদাঘাত, দেবালয়, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শকসমক্ষে, বিপদাপন্ন, সহোদর, ষোড়শ

D. নীচে কয়েকটি সমাসবদ্ধ পদ দেওয়া হল। এদের ব্যাসবাক্য করুন :

সমাসবদ্ধ পদ **ব্যাসবাক্য**

1. অসম্ভব =

2. সুভাষ-কাকিমা =

শব্দার্থ ও টীকা

3. চাঁচাছোলা =

4. অবেলা =

5. অম্লানবদন =

6. শুক্লপক্ষ =

7. রাতবিরেত =

8. অনিচ্ছা =

9. গাছতলা =

10. অনাসক্ত =

11. শেষকৃত্য =

12. মুখভঙ্গি =

13. লেখাপড়া =

14. বামুনদিদি =

15. মনোভাব =

16. লাঠিবসানো =

17. আনাচ-কানাচ =

18. গাঁ ঘর =

19. জেনেবুঝে =

20. প্রাণপণ =

শব্দার্থ ও টীকা

14

ভাষারীতি
(সাধু ও চলিত ভাষা)

14.1 প্রস্তাবনা

আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি কথা বলে অথবা লিখে। কথা মুখেই বলি বা লিখেই বলি তার একটা চাল থাকে। বলার বিষয়টা যদি হালকা চালের হয় তবে ভাষার মধ্যেও একটা হালকা বা চটুল চাল দেখা দেয়। আর বলার বিষয় যদি একটু ভারিক্কি ধরনের হয় তবে ভাষার মধ্যেও একটা ভারিক্কি চাল থাকে। এই হল ভাষার চাল। ভাষার চালকে অন্য কথায় বলা হয় ভাষারীতি। আমাদের লেখার ভাষায় দুরকম রীতি আছে: (১) সাধুরীতি — এটা পুরনো ধরনের, (২) চলিত রীতি — এটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

ভারিক্কি = গম্ভীর।

আগে গদ্য লেখার তেমন চল ছিল না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠ্যবই, সংবাদপত্র, ধর্মীয় ইস্তাহার, গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি লেখার প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে গদ্য লেখার চল হল। এই সময়ে বাঙালি সমাজের সংস্কৃতজানা পণ্ডিতেরা বাংলা গদ্য লিখতে গিয়ে ভাবলেন শিক্ষিত লোকের ভাষার চাল হালকা হওয়া উচিত নয়, গুরুগম্ভীর হওয়া উচিত। তাই তাঁরা তাঁদের লেখার ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে লাগলেন। এই ধরনের সংস্কৃতবহুল ভাষারীতিকে বলা হত সাধুভাষা। 'সাধু' শব্দটির অর্থ যা বা যে সাধন করে। এই ধরনের ভাষায় যেসব সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হত সেগুলো সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম সাধন করত। এজন্য ওই ভাষার নাম হল সাধু ভাষা। কিন্তু সাধু রীতির ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশি-বিদেশি-তদ্ভব মেশানো হালকা চালের ভাষা ব্যবহার চলতে থাকল। তর্ক উঠল মুখের ভাষা শুনে যখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, তবে তাকে লেখার বাক্যে ব্যবহার করা যাবেনা কেন? আবার প্রশ্ন উঠল, বাংলার কোন্ এলাকার মুখের ভাষা। শেষে স্থির হল কলকাতা এলাকায় সবারই যাতায়াত আছে। তাই কলকাতা এলাকার মুখের ভাষাকে ভিত্তি করেই নতুন লেখার ভাষা চালু হোক। 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। শুরু হল কলকাতা এলাকার কথ্য ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নতুন লেখার ভাষা, যাতে গম্ভীর, হালকা সব রকম ভাবই প্রকাশ করা যাবে। এই নতুন রীতিতে লেখার ভাষার নাম হল চলিত ভাষা। সমাজের সমস্ত অংশের মানুষই এই ভাষাকে লেখার ভাষা বলে মেনে নেওয়ায় এই ভাষাই হল মান্য চলিত বাংলা ভাষা (Standard Colloquial Bengali)।

ইস্তাহার = প্রচারপত্র।

শব্দার্থ ও টীকা

14.2 উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনারা—

- বাংলা লেখ্য গদ্য উপভাষার সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- সাধু ভাষারীতির প্রকৃতি বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন;
- চলিত ভাষারীতির প্রকৃতি বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন;
- সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার তফাত জানতে ও বুঝতে পারবেন;
- সাধু থেকে চলিত এবং চলিত রীতির বাক্যকে সাধুরীতিতে পরিবর্তন করতে পারবেন;
- বর্তমানে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে চলিত ভাষার প্রাধান্য বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন;
- বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে যে মান্য চলিত রীতির ব্যবহারেরই প্রাধান্য তা বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন।

14.3 বিষয়ের রূপরেখা

14.3.1

(১) কথাবার্তায়, নাটকের সংলাপে, বক্তৃতায়, (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) খবরের কাগজে, রেডিয়ো ও টি.ভি.র সংবাদপাঠে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় সেটা চলিত ভাষা। আপনি বলতে পারেন প্রায় সবই যখন চলিত ভাষাতেই হচ্ছে, তখন সাধু ভাষার কথা আসছে কেন। উত্তরে বলা যায়, প্রাচীন লেখকদের ভাষার সঙ্গে যে আমাদের পরিচিত হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র অবশ্য সাধু-চলিত দুই রীতিতেই লিখেছেন। সাধুভাষায় লেখা তাঁদের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ পড়ে বুঝতে হবে সেগুলোর বক্তব্য। তাই সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য আমাদের জানতে হবে।

(২) লিখতে গেলে, এমন-কি বলতে গেলে সাধু ও চলিত মিশে যেতে পারে। এ রকমটি ঘটলে তাকে বলে 'গুরু চণ্ডালী দোষ'। ভাষাতে এ দোষ যাতে না ঘটে তার জন্যও সাধু-চলিত সম্বন্ধে ঠিক মতো জেনে নেওয়া দরকার।

পাঠগত প্রশ্ন : 14.1

উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে উত্তর দিন —

1. নীচে সাধুভাষা / চলিত ভাষা — ঠিক জায়গায় বসান :

(a) নাটকে, কথাবার্তায় সাধারণত _____ ব্যবহৃত হয়।

(b) বিদ্যাসাগরের লেখায় _____ ব্যবহৃত হয়েছে।

(c) বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় _____ ব্যবহৃত হয়েছে।

2. সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য জানা দরকার কী জন্য? ঠিক উত্তরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

(a) রেডিয়োর খবর শুনে বোঝার জন্য।

শব্দার্থ ও টীকা

(b) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিষয় জানার জন্য।

(c) বক্তৃতা দেবার জন্য।

14.3.2 কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে বুঝতে পারবেন চলিত ও সাধু ভাষার ব্যবহার কী ভাবে হয়। চলিত ও সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা হবে।

(i) — কেমন আছেন হরিপদবাবু?

— এই চলে যাচ্ছে। আপনি কোথায় চললেন?

— আপনার কাছেই যাচ্ছি।

— কী ব্যাপার বলুন তো?

— সাধু আর চলিত ভাষা রীতির বিষয়ে একটু কথা ছিল।

(— এটি সাধারণ কথাবার্তার নমুনা।) (চলিত রীতির উদাহরণ)

(ii) (বনপথ। একটি বাঘ খাঁচায় আটকে পড়েছে। একজন লোক সে পথ দিয়ে আসছে।)

বাঘ — ও ভাই, একটু শুনবে। একটু এ দিকে আসবে ভাই।

লোক — এই বনে-বাদাড়ে ভাই ডাকছে কে? গলাটা তো মানুষের মতো নয়।

বাঘ — এই যে আমি। আমি ডাকছি তোমায়।

লোক — ও! এযে খাঁচায় পড়েছে। তাহলে যাই একবার (খাঁচার কাছে গেল) — বলো — কী বলছিলে?

বাঘ — এই খাঁচার দরজাটা একটু খুলে দেবে?

লোক — বটে! আমি খাঁচা খুলে দিই, আর বাইরে এসে তুমি আমার ঘাড় মটকাবে, তাই না!

(এটি 'দুষ্টের শাস্তি' নাটিকার সংলাপ। নাট্যকার - উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী) (চলিত রীতির উদাহরণ)

(iii) কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি :

প্রবীণ জননেতা, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর স্মরণে, শ্রদ্ধায় আজ শহরের সব পথ মিশে যাবে শহিদ মিনার ময়দানে। সন্দেহ নেই অনেকেই ঢুকতে পারবেন না মূল ময়দানে। তবু পথ হাঁটবেন ফুল হাতে। (সংবাদ) (চলিত রীতির উদাহরণ)

(iv) তখন সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি গর্বিত বাক্যে বলিল, মহাশয়, আমরা বহুকালের অসভ্য জাতি; আপনারা সভ্য জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখুন, সৌজন্য সদ্ব্যবহারের বিষয়ে অসভ্য জাতি, সভ্য জাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট।

('সভ্য ও অসভ্য' - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) (সাধু রীতির উদাহরণ)

(v) বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, ''মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না — ও মূর্খ কী প্রকারে বলিবে?''

('সাগরসঙ্গমে নবকুমার' - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) (সাধু রীতির উদাহরণ)

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 14.2

উদাহরণ (i) - (v) পড়ে নিয়ে উত্তর করুন —

B. ৩. ডানদিকে ভাষারীতি উল্লেখ করুন —

লেখা	ভাষারীতি
(a) বাঘ — এই খাঁচার দরজাটা একটু খুলে দেবে?	_____
(b) ও মূর্খ কী প্রকারে বলিবে?	_____
(c) আপনার কাছেই যাই।	_____
(d) তবু পথ হাঁটবেন ফুল হাতে।	_____
(e) অসভ্যজাতি সভ্যজাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট।	_____

14.3.3 সাধু ও চলিতের রূপগত তফাত আছে। এই তফাত দুই রীতির ভাষার ক্রিয়া, সর্বনাম, অনুসর্গ (থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা) ও অন্যান্য কয়েকটি অব্যয়, বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতির রূপ দেখলে বোঝা যায়।

নীচে দুদিকের ক্রিয়াগুলির রূপ ভালো করে লক্ষ করুন :

(i)	মহাদেব সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যেত।	মহাদেব সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছাইয়া যাইত।
(ii)	তাহলে লক্ষ্যটা ফস্কে যেত না।	তাহা হইলে লক্ষ্যটি ফস্কাইয়া যাইত না।
(iii)	তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।	তিনি বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই অংশের ক্রিয়াপদ	এই অংশের ক্রিয়াপদ
পৌঁছে	পৌঁছাইয়া
যেত	যাইত
হয়ে	হইয়া
পড়েছিলেন	পড়িয়াছিলেন

পাঠগত প্রশ্ন : 14.3

উদাহরণ পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

1. নীচের দুদিকের অংশের সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি চিহ্নিত করুন —

(i)	তিনি প্রহার করিতে লাগিলেন।	তিনি প্রহার করতে লাগলেন।
(ii)	অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকিবে।	অনেকে নির্দেশ করে থাকবে।
(iii)	সে ঘুড়ি উড়াইতে চাহিল।	সে ঘুড়ি ওড়াতে চাইল।
(iv)	সব আনিতে হইত।	সব আনতে হত।
(v)	তুমি বলিয়া বেড়াইতেছ।	তুমি বলে বেড়াচ্ছ।
(vi)	এটি দেখিতে পাইয়াছি।	এটি দেখতে পেয়েছি।

শব্দার্থ ও টীকা

ক্রিয়ার সাধুরূপ				ক্রিয়ার চলিতরূপ			
(1)	(2)			(1)	(1)		
(3)	(4)			(3)	(4)		
(5)	(6)			(5)	(6)		
(7)	(8)			(7)	(8)		
(9)	(10)			(9)	(10)		
(11)	(12)			(11)	(12)		
(13)	(14)			(13)	(14)		

৫. **বাঁদিকের ক্রিয়ার সাধুরূপ অনুযায়ী ডানদিকের চলিত রূপটিতে টিক (✓) দিন :**

(a) গাহিতে — গাইতে / গেতে

(b) খাইয়াছি — খাচ্ছি / খেয়েছি

(c) করিলেন — করলেন / করেছিলেন

(d) করিতেছিলেন — করলেন / করছিলেন

14.3.4 সাধুভাষার সঙ্গে চলিতভাষার প্রধান পার্থক্য ক্রিয়াপদের রূপের। ক্রিয়া দু'রকমের — **অসমাপিকা** ও **সমাপিকা** ক্রিয়া।

অসমাপিকা ক্রিয়া (যে ক্রিয়া বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারে না) : সাধুভাষার অসমাপিকা ক্রিয়ার — বিভক্তি ইয়া, ইতে, ইলে। চলিত ভাষায় যথাক্রমে এ, তে, লে, হয়।

যেমন,	ইয়া	>	এ	ইতে	>	তে	ইলে	>	লে
	সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত
	বলিয়া		বলে	পড়িতে		পড়তে	চলিলে		চললে
	করিয়া		করে	যাইতে		যেতে	দেখিলে		দেখলে

সমাপিকা ক্রিয়া (যে ক্রিয়া বাক্যকে সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে : মনে রাখবেন, সাধারণ বর্তমানকালের সাধু ও চলিত-এর ক্রিয়ারূপ এক। বাকি জায়গায় পরিবর্তন করা যায়।

ক) ঘটমান বর্তমান :

সাধু	—	চলিত	উদাহরণ		
			সাধু	—	চলিত
ইতেছ,		ছ, চ্ছে	যাইতেছ		যাচ্ছ
ইতেছে		ছে, চ্ছে	হাঁটিতেছে		হাঁটছে
ইতেছি		ছি, চ্ছি	বলিতেছে		বলছে
দেখাইতেছে		দেখাচ্ছে	পড়াইতেছি		পড়াচ্ছি

খ) ঘটমান অতীত : উদাহরণ—

সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত
যাইতেছিলে		যাচ্ছিলে	বলিতেছিলাম		বলছিলাম
করিতেছিল		করছিল	শুনিতেছিলাম		শুনেছিলাম

শব্দার্থ ও টীকা

গ) পুরাঘটিত বর্তমান : উদাহরণ—

সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত
ইয়াছি		এছি	বলিয়াছ		বলেছ
ইয়াছে		এছে	করিয়াছে		করেছে
ইয়াছ		এছ	দেখিয়াছ		দেখেছ

ঘ) পুরাঘটিত অতীত : উদাহরণ —

সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত
ইয়াছিল		এছিল	করিয়াছিল		করেছিল
ইয়াছিলাম		এছিলাম	বলিয়াছিলাম		বলেছিলাম

ঘ) সাধারণ অতীত/ভবিষ্যৎ : উদাহরণ —

সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত
ইল		ল	করিল		করল
ইলাম		লাম	বলিলাম		বললাম
ইব		ব	দেখিব		দেখব
ইবে		বে	শুনিবে		শুনবে
ইলে		লে	পড়িলে		পড়লে

ঘ) নিত্যবৃত্ত অতীত : উদাহরণ —

সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত
ইত		ত	করিত		করত
ইতে		তে	করিতে		করতে
ইতাম		তাম	বলিতাম		বলতাম

14.3.5 সাধু চলিতের সর্বনামের রূপের তফাত।

নীচের দু-দিকের সর্বনামগুলি দেখলে তাদের রূপের তফাতটা ধরতে পারবেন :

সাধু	**চলিত**
তাহাদের মতলব ছিল খারাপ।	তাদের মতলব ছিল খারাপ।
কাহারো হাতে বাঁশের লাঠি।	কারো হাতে বাঁশের লাঠি
ভূষণ কাহাকে ধরে?	ভূষণ কাকে ধরে?
ইহার নাম কী?	এর নাম কী?
উহা তো জানা ছিল না।	ওটা তো জানা ছিল না।

সর্বনামের সাধুরূপ	**সর্বনামের চলিত রূপ**
তাহাদের	তাদের
কাহারও	কারও

শব্দার্থ ও টীকা

কাহাকে	কাকে
ইহার	এর
উহা	ওটা
তাহার	তাঁর

কয়েকটি সর্বনামের সাধু-চলিত রূপ দেখুন :

সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে	সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে
যাহা	যা	তাহা	তা
ইহা	এ, এটি, এটা	উহা	ও, ওটি, ওটা
তিনি	উনি	উঁহার	ওঁর, ওনার
তাহাকে	তাকে	তাহাদিগকে	তাদেরকে, তাদের
তাঁহাকে	তাঁকে	তাঁহার	তাঁর
যাহাকে	যাকে	তাহাদের	তাদের
যাঁহাকে	যাঁকে	তাঁহাদেরকে	তাঁদেরকে
মদীয়	আমার	ত্বদীয়	তোমার
তদীয়	তার	ভবদীয়	আপনার
অন্যদীয়	অন্যের	সর্ব	সব

পাঠগত প্রশ্ন : 14.4

অনেকগুলি সর্বনাম পদের রূপ শিখলেন। এবার এগুলির সাহায্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

1. নীচের পদগুলির মধ্যে চলিত রীতির সর্বনাম পদ আছে। সেগুলি খুঁজে নিয়ে লিখুন।

তাহাকে

তাঁহার

তাদের

তাহাদের

তাঁকে

2. নীচের পদগুলির মধ্যে সাধু রীতির সর্বনাম পদ আছে। সেগুলি খুঁজে নিয়ে লিখুন।

ওর

তাঁদের

ওঁর

তোমাদিগের

তাকে

3. নীচের বাক্যগুলির সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলি চিহ্নিত করে শূন্যস্থানে লিখুন :

(i) তুমি ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাইতেছ। .....

শব্দার্থ ও টীকা

(ii) আর কেহ না জানিলেও আমি তাহা জানি। .....

(iii) আপনি ওইটাকে আবার কোথায় পাইলেন? .....

(iv) তাহাতে কিছু হইবে না। .....

14.3.6 সাধু ভাষায় ও চলিত ভাষায় ক্রিয়া ও সর্বনামের রূপের তফাত দেখা গেছে। সাধু-চলিতের অনুসর্গেরও কিছু পার্থক্য আছে। নীচের বাক্যগুলি দেখলে তা বোঝা যাবে।

গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল।	গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল।
ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।	ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল।
লোকটির কাছে গেল।	লোকটির নিকটে গেল।
রাতের চেয়ে দিন ভালো।	রাত অপেক্ষা দিন ভালো।

উপরের চলিত অনুসর্গ	উপরের সাধু অনুসর্গ
থেকে	হইতে
দিয়ে	দিয়া
কাছে	নিকটে
চেয়ে	অপেক্ষা

সাধু রীতির ও চলিত রীতির কয়েকটি অনুসর্গ দেখুন :

সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে	সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে
সহিত/সমভিব্যাহারে	সঙ্গে, সাথে	হইতে / অপেক্ষা/	চেয়ে
নিমিত্ত	জন্য	চাহিতে/ ন্যায়	
অনন্তর	তারপর	সদৃশ, তুল্য	মতন/মতো/মত
		অভিমুখে	দিকে

এমন দু-একটি অনুসর্গ আছে, যেগুলো সাধু-চলিত দুই রীতিতেই চলে। লক্ষ্য করুন—

সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে
জন্য	জন্য
পরে	পরে
সঙ্গে	সঙ্গে

পাঠগত প্রশ্ন 14.5

উদাহরণ ৭.৬ - ৭.৮ পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

1. **নীচের বাক্যগুলিতে ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গগুলো চিহ্নিত করে শূন্যস্থানে বসান ঃ**

(i) তাহার সহিত আবার ঝগড়া করিলে। ....

শব্দার্থ ও টীকা

(ii) সে তো তোমার নিমিত্ত অনেক করিয়াছে। ....

(iii) তুমি নদী অভিমুখে যাইতেছিলে। ....

(iv) সে অন্যদিক দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। ....

14.3.7 এরকম আরও কয়েকটি শব্দ আছে যেগুলির সাধু রূপ ও চলিত রূপে তফাত দেখা যায়। তবে এরকম শব্দ সাধু-চলিত দুই রীতিতেই ব্যবহার হতে দেখা যায়। সেজন্য এই সাধু ও চলিতের তফাত বোঝার পক্ষে খুব একটা দরকারি নয়।

সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে	সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে
ভিতর	ভেতর	পূজা	পুজো
তুলা	তুলো	শৃগাল	শেয়াল
মাহিনা	মাইনে	বানর	বাঁদর
পূর্ব	পুব	মূর্খ	মুখ্যু
সন্ধ্যা	সন্ধে	তিনটা	তিনটে
মহাশয়	মশায়	বৎসর	বছর
প্রাতঃকাল	সকাল		

পাঠগত প্রশ্ন : 14.6

উদাহরণ পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

1. চিহ্নিত শব্দগুলি পরিবর্তন করে নীচের বাক্যগুলি ডান দিকে চলিত ভাষায় লিখুন :

(i) <u>প্রাতঃকাল</u> <u>হইতে</u> বৃষ্টি <u>পড়িতেছে</u>। (i) .....

(ii) <u>তাহারা</u> <u>কেহই</u> কাজে <u>বাহির</u> <u>হইতে</u> পারে <u>নাই</u>। (ii) .....

(iii) <u>সকলেই</u> ঘরের <u>ভিতর</u> <u>বসিয়া</u> আছে। (iii) .....

পাঠগত প্রশ্ন : 14.7

উদাহরণ পড়ে নিয়ে উত্তর দিন :

1. নীচের যে বাক্যে সাধু-চলিতের মিশে যাবার ফলে ভাষার গুরু-চণ্ডালী দোষ ঘটছে তার পাশে কাটা (✗) চিহ্ন, এবং যেখানে দোষ হয়নি তার পাশে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন :

(a) এটা কে লিখেছে? ☐

(b) আমি তো এটা লিখি নাই। ☐

(c) আমি বললাম, 'ভালো করে দেখুন'। ☐

(d) তিনি পূর্বপাড়া থেকে পুত্র সমভিব্যাহারে আসছিলেন। ☐

(e) প্রত্যহ কিছুক্ষণ হাঁটিয়া আসিলে ভালো হয়। ☐

শব্দার্থ ও টীকা

(f) 'আবার আসিব ফিরে . . . এই বাংলায়।' — জীবনানন্দ দাশ

(g) তখন হইতে খালি বকবক করিয়া যাচ্ছ।

(h) খুলিতে এসেছি সকল বন্ধ দ্বার। — কাজী নজরুল ইসলাম

(i) প্রহর চলিয়া যায় বেলা পড়ে আসে। — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

14.4 আপনি যা শিখলেন

(i) সাধুরীতির ভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও ওই রীতিতে লেখবার ও বলবার পদ্ধতি।

(ii) চলিতরীতির ভাষার কিছু বিশেষত্ব ও ওই রীতিতে বলবার ও লেখবার কৌশল।

(iii) সাধুরীতি ও চলিতরীতির ভাষার প্রভেদ।

(iv) দুটি রীতিতেই ভিন্নভাবে লেখবার ও বলবার কৌশল।

(v) বর্তমানে বলা বা লেখা, উভয় ক্ষেত্রেই চলিত রীতির ব্যবহার।

(vi) সাধুরীতির ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা।

পাঠান্ত প্রশ্ন : 14.5

1. নীচে অনেকগুলি ক্রিয়াপদ দেওয়া আছে। তাদের মধ্যে যেগুলি সাধুরীতিতে লেখা সেগুলি বেছে নিয়ে সাধু চিহ্নিত শূন্যস্থানগুলিতে বসান এবং যেগুলি চলিত রীতিতে লেখা সেগুলি বেছে নিয়ে চলিত চিহ্নিত শূন্যস্থানগুলিতে বসান।

	সাধু	চলিত
তাকাতেই, খাইয়া	(a) _____	(d) _____
চলতে, পড়িয়াছি	(b) _____	(e) _____
ফেলিবার, ধরবার	(c) _____	(f) _____

2. নীচে থেকে চলিতরীতিতে লেখা অনুসর্গগুলি বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান:

হইতে, থেকে, দিয়ে, দ্বারা	(a) _____	(c) _____
কাছে, ন্যায়, নিকট, পরে	(b) _____	(d) _____

শব্দার্থ ও টীকা

3. নীচে (ক) গুচ্ছে সাধুরীতির পদ ও (খ) গুচ্ছে চলিতরীতির পদ দেওয়া আছে। বাঁ দিকের সংখ্যা দিয়ে পদগুলি মেলান। আপনাদের সুবিধার জন্য একটি দেখিয়ে দেওয়া হল :

(ক) গুচ্ছ	(খ) গুচ্ছ	
1. করিল	করতে	( )
2. করিয়াছিল	করত	( )
3. করিতেছিল	করছে	( )
4. করিবে	করছিল	( )
5. করিত	করল	( )
6. করিতেছে	করবে	( )
7. করিতে	করেছিল	( )

4. নীচের চলিতরীতির বাক্যগুলিকে সাধুরীতিতে পরিবর্তন করুন :

a) মা বাড়ি এসে দালানে পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন।

b) তখন মনে হত বুঝি এমন ভালোবাসাবাসি আর জগতে নেই।

c) এই সুরেশদা তো তোমাদের দোর দিয়েই যাবেন।

d) একপাশে দাঁড়িয়ে আমিও দেখছিলাম সব।

e) চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরতে পুরতে বললেন।

f) উত্তর দেবার স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখেও এঁরা প্রশ্ন করতে ছাড়বেন না।

5. নীচের সাধুরীতির বাক্যগুলিকে চলিতরীতিতে পরিবর্তন করুন :

a) যে যাহার কর্মফল লইয়া আসিয়াছে, ভোগ না করিয়া উপায় কী?

b) আমার সহিত কি আপনারা কেহ যাইবেন পিসিমা?

c) সে কথা পূর্বে খেয়াল হয় নাই, খেয়াল হইল সুভাষ-কাকিমার দরজায় আসিয়া।

d) — আসিয়াছ তো ভালোই হইয়াছে ভাই — বলিয়াই থামিলেন —

e) সুভাষ-কাকিমা একমুহূর্ত চুপ পরিয়া থাকিলেন, তাহার পর বলিলেন — কী জানি বুঝিতে পারিতেছি না।

f) ভাবিতেছি কী করিয়া পারিলেন?

g) পেডুয়াতে অষ্টাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়া, তিনি পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত যে-সকল নূতন নূতন নিয়ম উদ্ভাবিত করেন, তাহা তৎকাল-প্রচলিত মতের নিতান্ত বিপরীত।

h) বিপক্ষেরা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করাতে, ১৬৩৩ খ্রি: অব্দের শীতকালে, তাঁহাকে রোমনগরে গমন করিতে হইল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, ধর্মসভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

i) কিন্তু ইটালির প্রদেশান্তরীয় লোকেরা, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া, ১৫৯২ খ্রিঃ অব্দে, তাঁহাকে পেডুয়ার বিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

6. **সাধুকে চলিতে এবং চলিতকে সাধুতে পরিবর্তিত করুন :**

a) নিযুক্ত করিলেন —

b) প্রদেশ হইতেও —

c) প্রচারিত হইবামাত্র —

d) প্রদর্শন করিতেছিলেন —

e) ভার অর্পিত হইল —

f) আসিয়া গিয়াছে —

g) তাঁর —

h) বুঝতে পেরে —

i) তাঁকে —

j) পরীক্ষা করলেন —

k) না-ছুঁয়ে বললে —

14.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

14.1

(a) — চলিত ভাষা

(b) — সাধু ভাষা

(c) — সাধু ভাষা

14.2 (b)

14.3

	সাধুরূপ		চলিতরূপ
(i)	করিতে, লাগিলেন	(i)	করতে, লাগলেন
(ii)	করিয়া, থাকিবে	(ii)	করে, থাকবে
(iii)	উড়াইতে, চাহিল	(iii)	ওড়াতে, চাইল
(iv)	আনিতে, হইত	(iv)	আনতে, হত
(v)	বলিয়া, বেড়াইতেছে	(v)	বলে, বেড়াচ্ছ
(vi)	চলিয়া যাইতে, পারিব	(vi)	চলে যেতে, পারব
(vii)	দেখিতে, পাইয়াছি	(vii)	দেখতে, পেয়েছি

শব্দার্থ ও টীকা

14.3

(a) — গাইতে

(b) — খেয়েছি

(c) — করলেন

(d) — করছিলেন

14.4

(a) — তাঁকে, তাঁদের।

14.4

(a) — তোমাদিগের

14.4

(i) তুমি— ডুবিয়া, খাইতেছ

(ii) কেহ, আমি, তাহা— জানিলে, জানি

(iii) আপনি, ওইটাকে— পাইলেন

(iv) তাহাতে— হইবে

14.5

(i) করিলে — তাহার — সহিত

(ii) করিয়াছে— সে, তোমার — নিমিত্ত

(iii) যাইতেছিলে — তুমি — অভিমুখে

(iv) অগ্রসর হইতেছিল— সে— দিয়া

14.6

(i) সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে।

(ii) তারা কেউই কাজে বের হতে পারে নি।

(iii) সবাই ঘরের ভেতর বসে আছে।

14.7

(a) ✓

(b) ✗

শব্দার্থ ও টীকা

(c) ✓

(d) ✗

(e) ✓

(f) ✗

(g) ✗

(h) ✗

(i) ✗

15

বাক্যের রূপান্তর

(ক) গঠনগত, (খ) অর্থগত

15.1 প্রস্তাবনা

ভাষা ভাবের বাহন। ভাষা গঠিত হয় বাক্য নিয়ে। বাক্যই ভাবকে বহন করে। মনের বিচিত্র ভাব কিন্তু একরকম বাক্যে প্রকাশিত হয় না। তার নানান চেহারা, নানান ভাব। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক বিভিন্ন রকম বাক্যের প্রকৃতি। — (ক) আমি বই পড়ি। (খ) তুমি কী করছ? (গ) উঃ! কী শীত! (ঘ) তুমি গল্প বলো। (ঙ) তুমি গেলে আমি যাব। (চ) সীমা কাল বাড়ি যাবে। (ছ) যদি তুমি যাও তবে আমি যাব। (জ) তুমি যাবে কিন্তু আমি যাব না।

এই বাক্যগুলির মধ্যে (ক) থেকে (ঙ) পর্যন্ত বাক্যে তার বিভিন্ন চেহারার পরিচয় রয়েছে, আর (চ) থেকে (জ) পর্যন্ত বাক্যে তার বিভিন্ন ভাব বা অর্থের প্রকাশ ঘটেছে। এই হিসেবে বাক্যের দুটি রূপ — (ক) একটি গঠনগত, অন্যটি (খ) অর্থগত।

আমরা এই দুটি দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

15.2 উদ্দেশ্য

এ পাঠটি আলোচনা করলে আপনারা :

- বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য যে বিষয় ও ভাববৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে, তা জেনে বাক্যের রূপান্তর করতে পারবেন;
- বিভিন্ন শ্রেণির বাক্যের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন;
- প্রদত্ত বাক্যের শ্রেণি শনাক্ত করতে পারবেন;
- প্রদত্ত বাক্যের বিশ্লেষণ করতে পারবেন;

শব্দার্থ ও টীকা

- এই পাঠটি শিখলে অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবৈচিত্র্য জানতে পারবেন;
- বাক্যের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;
- নিজেও এই অর্থের বাক্যকে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারবেন।

15.3 বিষয়ের রূপরেখা

15.3.1 বাক্যের গঠনগত রূপ

গঠনগত দিক থেকে বাক্য চার রকমের — (ক) সরল বাক্য; (খ) যৌগিক বাক্য; (গ) জটিল বাক্য; এবং (ঘ) মিশ্রবাক্য।

(ক) সরলবাক্য : (সরল = সরাসরি)

(i) সে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। (ii) সন্ধে হলে আমরা বাড়ি ফিরলাম।

বাক্য দুটিতে 'ওড়াচ্ছে' এবং 'ফিরলাম' দুটি সমাপিকা ক্রিয়া। দুটি বাক্যের কর্তা 'সে' এবং 'আমরা'-র কাজ সম্পন্ন করছে। এ বাক্য দুটিকে বলে সরলবাক্য। কেননা এতে একটি উদ্দেশ্য (কর্তা) এবং একটি বিধেয় (ক্রিয়া) রয়েছে।

সুতরাং যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা ও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে বলে সরলবাক্য।

সরলবাক্য অর্থ কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার সরাসরি সম্পর্ক।

(খ) যৌগিক বাক্য : (যোগ করে গঠিত)

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক —

তিনি একাই পাহাড়ে উঠলেন, কিন্তু তাঁর বন্ধু উঠতে পারলেন না।

এখানে 'তিনি' কর্তার ক্রিয়া হল 'উঠলেন' আর 'তাঁর বন্ধু' কর্তার ক্রিয়া হচ্ছে 'পারলেন না'। দেখা যাচ্ছে দুটি সরল বাক্য একসঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে এবং বাক্য দুটিকে যুক্ত করতে সাহায্য করেছে 'কিন্তু' এই অব্যয় বা সংযোজক শব্দটি।

সুতরাং, একাধিক সরল বা স্বাধীন খণ্ডবাক্য যখন সংযোজক শব্দ বা বিভিন্ন জাতীয় অব্যয়পদ দিয়ে যুক্ত হয় এবং একটি পূর্ণবাক্যে পরিণত হয়, তাকে বলে যৌগিক বাক্য।

(গ) জটিলবাক্য :

একটি উদাহরণ — যে মেয়েটি এখানে এসেছিল, সে সতীর বোন ছিল না।

এখানে কর্তা 'মেয়েটি'র ক্রিয়া হল 'এসেছিল' এবং 'সে' কর্তার ক্রিয়া হল 'ছিল'। দুটি আলাদা বাক্য একসঙ্গে বসেছে ঠিক, কিন্তু বাক্যদুটিই প্রধান নয়। 'সে সতীর বোন ছিল না' বললে মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে। এটি একটি স্বাধীন খণ্ডবাক্য। কিন্তু 'যে মেয়েটি এখানে এসেছিল' বললে প্রশ্ন থেকে যায় 'কোন মেয়েটি?' সুতরাং এ খণ্ডবাক্যটি অন্য খণ্ডবাক্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় একে বলে অপ্রধান খণ্ডবাক্য।

শব্দার্থ ও টীকা

একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য মিলে একটি পূর্ণবাক্য গঠন করলে তাকে বলে জটিল বাক্য।

(ঘ) মিশ্রবাক্য :

একটি উদাহরণ , 'বাড়িতে আরও জায়গা ছিল, কিন্তু সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই।' — এখানে 'বাড়িতে . . . ছিল' সরল বাক্য, 'সেটা . . . পারি নাই' জটিল বাক্য এবং 'কিন্তু' দুটি বাক্যকে যোগ করেছে। এটি মিশ্রবাক্য।

এভাবে মিশ্রবাক্য তৈরি হতে পারে — (i) সরল ও জটিল এর মিশ্রণে; (ii) যৌগিক ও জটিল বাক্যের মিশ্রণে; (iii) যৌগিক ও যৌগিক বাক্যের মিশ্রণে; এবং (iv) সরল ও যৌগিক বাক্যের মিশ্রণে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

বাক্য পরিবর্তনের কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হল :

(ক) জটিল : তাতে এই ঘটনা ঘটল যে তাঁর নামে ধর্মদ্রোহী বলে অভিযোগ তোলা হল। (সরলবাক্য)
সরল : তাতে তাঁর নামে ধর্মদ্রোহী বলে অভিযোগ তোলার ঘটনা ঘটল।

(খ) সরল : শীতকালে তাঁকে রোমনগরে যেতে হল। (জটিলবাক্য)
জটিল : যখন শীতকাল তখন তাঁকে রোমনগরে যেতে হল।

(গ) সরল : গালিলিয় নতুন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রয়োগ করে অনেক কিছু দেখতে পেলেন। (যৌগিকবাক্য)
জটিল : গালিলিয় নতুন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রয়োগ করলেন এবং অনেক কিছু দেখতে পেলেন।

(ঘ) জটিল : তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে যে-যথার্থ মত অবলম্বন করেছিলেন তার অনুশীলনে বিরত হননি। (যৌগিক বাক্য)
যৌগিক : তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে যথার্থ মত অবলম্বন করেছিলেন এবং তার অনুশীলনে বিরত হননি।

(ঙ) সরল : জেন্‌সন নামক এক ওলন্দাজ এক অভিনব যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। (জটিলবাক্য)
জটিল : জেন্‌সন নামে একজন ওলন্দাজ ছিলেন যিনি এক অভিনব যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 15.1

1. ডানদিক থেকে বেছে ঠিক উত্তরটি শূন্যস্থানে বসান :

(ক) বাক্য _____ শ্রেণিতে বিভক্ত। (দুই/ তিন/ চার)

(খ) সরলবাক্যে থাকে _____ ক্রিয়া। (একাধিক সমাপিকা/ একটি সমাপিকা/ একটি অসমাপিকা)

(গ) যৌগিক বাক্য গঠনে দুটি বাক্যকে যুক্ত করা হয় _____ দিয়ে। (বিশেষ্য পদ/ সর্বনাম পদ/ অব্যয় পদ।)

(ঘ) জটিল বাক্য গঠিত হয় _____ দিয়ে। (একটি প্রধান ও এক বা একাধিক খণ্ড বাক্য/ দুটি

শব্দার্থ ও টীকা

প্রধান খণ্ডবাক্য/ দুটি অপ্রধান খণ্ডবাক্য)

(ঙ) মিশ্রবাক্য হল _____ অন্যরূপ। (যৌগিক বাক্যের/ জটিল বাক্যের/ গঠনগত বাক্যের)

2. গঠনগত দিকে বাক্য কত রকমের ও কী কী?

3. একটি বাক্যে একাধিক ক্রিয়া থাকলে কী কী বাক্য হতে পারে?

4. ঠিক উত্তরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন। ভুল হলে (✗) চিহ্ন দিন :

(ক) একটি অসমাপিকা ক্রিয়া একটি বাক্যকে সম্পূর্ণ করতে পারে। ( )

(খ) সমাপিকা ক্রিয়া ছাড়া কোনো বাক্য সম্পূর্ণ হতে পারে না। ( )

(গ) কোনো সংযোজক শব্দ ছাড়া যৌগিক বাক্য তৈরি হতে পারে না।( )

(ঘ) জটিল বাক্যের দুটি বাক্যাংশই দুটি প্রধান খণ্ডবাক্য। ( )

(ঙ) একটি যৌগিক বাক্যকে সরলবাক্যে রূপান্তরের সময়ে দুটি সমাপিকা ক্রিয়াকেই অপরিবর্তিত রাখা যায়। ( )

15.3.2 বাক্যের অর্থগত দিক :

অর্থের দিক দিয়ে বাক্যকে সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল — (একটি ছকে দেখানো হল):

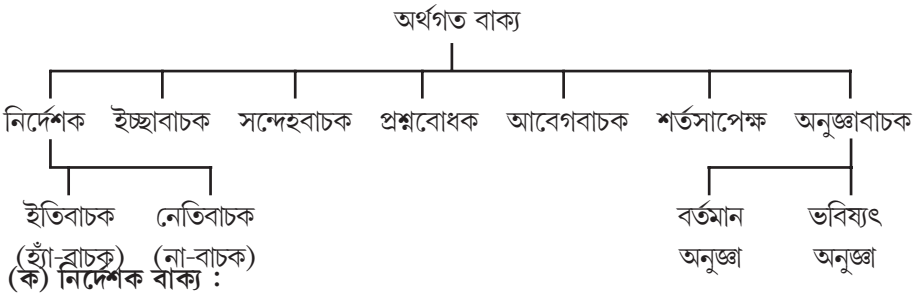

(ক) নির্দেশক বাক্য :

(i) আমি বাড়ি যাই। (ii) আমি বাড়ি যাই না।

বাক্যদুটির মধ্য দিয়ে দুটি আলাদা ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। একটিতে বাড়ি যাওয়ার কথা বলা হয়েছে আর অন্যটিতে না-যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ জাতীয় বাক্যকে বলা হয় নির্দেশক বাক্য।

যে বাক্যে কোনো বক্তব্য সাধারণভাবে নির্দেশ করা হয় বা সাধারণভাবে বর্ণনা দেওয়া হয় তাকে বলে **নির্দেশক বাক্য**।

আবার যে নির্দেশক বাক্যে কোনো কিছুর অস্তিত্ব 'আছে' এটা এই অর্থ প্রকাশিত হয়, তাকে বলে **ইতিবাচক নির্দেশক বাক্য** বা **হ্যাঁ-বাচক নির্দেশক বাক্য**।

আর, যে নির্দেশক বাক্যে কোনো কিছু সম্বন্ধে অস্বীকার বা নিষেধ করা বোঝায়, তাকে বলে **নেতিবাচক নির্দেশক বাক্য বা না-বাচক নির্দেশক বাক্য**।

ওপরের (i) বাক্যটি অর্থাৎ 'আমি বাড়ি যাই' হল ইতিবাচক নির্দেশক বাক্য এবং (ii) বাক্য, অর্থাৎ 'আমি

বাড়ি যাই না' হল নেতিবাচক নির্দেশক বাক্য।

(খ) ইচ্ছাবাচক বাক্য :

(i) দীর্ঘজীবী হও। (ii) ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। (iii) 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'

তিনটি বাক্যের মধ্যে বক্তার ইচ্ছা, প্রার্থনা ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করছে। এ জাতীয় বাক্যকে বলা হয় **ইচ্ছাবাচক বাক্য**।

(গ) সন্দেহবাচক বাক্য :

(i) সম্ভবত সে অসুস্থ। (ii) বোধহয় তোমাকে দিয়ে কাজ হবে।

বাক্যদুটির মধ্যে সম্ভাবনার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে, নিশ্চয়তা নয়। (কিছুটা সংশয় থেকে যাচ্ছে — হতেও পারে, আবার না হতেও পারে, এমন)। এ জাতীয় বাক্যকে সন্দেহবাচক বাক্য বলে।

যে বাক্যে সন্দেহ, সম্ভাবনা, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, তাকে বলে **সন্দেহবাচক বাক্য**।

(ঘ) প্রশ্নবোধক বাক্য :

(i) আপনি যাবেন কি? (ii) শশী কোন্ কাজটা করতে পারে না?

বাক্যদুটিতে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এ জাতীয় বাক্যকে বলে **প্রশ্নবোধক বাক্য**।

যে বাক্য দিয়ে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা হয়, তাকে বলে প্রশ্নবোধক বাক্য।

(ঙ) আবেগবাচক বাক্য :

(i) আহা! কী সুন্দরই না মেয়েটি! (ii) ছি:! একাজ তোমার!

প্রথম বাক্যে বক্তার মুগ্ধ হবার ভাব প্রকাশ পেয়েছে, আর (ii) বাক্যে ঘৃণার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এজাতীয় বাক্যকে বলে **আবেগসূচক বাক্য**।

যে বাক্যে মনের আবেগ, উচ্ছ্বাস, বিস্ময়, মুগ্ধতা ইত্যাদি ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে বলে **আবেগসূচক বাক্য**।

(চ) শর্তসাপেক্ষ বাক্য :

(i) যদি আপনি আদেশ করেন, তবে আমি এ কাজ করতে পারি। (ii) যদি কথা না শুনি, তাহলে তুমি কিছুই করতে পার না।

বাক্য-দুটিতে 'যদি - তবে', 'যদি - তাহলে' ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটি কাজের ওপর আর একটি কাজের নির্ভর করা বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ একটা শর্ত থাকছে। এ জাতীয় বাক্যকে বলে **শর্তসাপেক্ষ বাক্য**।

যে বাক্যে 'যদি' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে দুটি বিষয়ের মধ্যে শর্ত আরোপ করা হয় তাকে বলে **শর্তসাপেক্ষ বাক্য**।

(ছ) অনুজ্ঞাবাচক বাক্য :

শব্দার্থ ও টীকা

(i) কী করতে হবে বলুন। (ii) তুমি সেখানে যেও (যাবে)।

বাক্যদুটির (i) তে অনুরোধ করা এবং (ii) তে আদেশ করা বোঝাচ্ছে। কিন্তু ঘটনা দুটি দুটি কালের — প্রথমটি বর্তমান কালের, আর দ্বিতীয়টি ভবিষ্যৎ কালের। এ জাতীয় বাক্যকে বলে **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য**।

যে বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, নিষেধ ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বলে **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য**।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য আবার দুটি কাল-এ ব্যবহৃত হতে পারে — বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অনুজ্ঞাবাচক বাক্য কেবল মধ্যম পুরুষেই ব্যবহৃত হয়।

বর্তমান অনুজ্ঞা : বর্তমান কালের যে বাক্যে আদেশ ইত্যাদি বোঝায় তাকে বলে **বর্তমান অনুজ্ঞা**। যেমন: তুমি এ বইটা পড়ো তো।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : ভবিষ্যৎ কালে ব্যবহৃত যে বাক্যে অনুরোধ, উপদেশ, ইত্যাদি বোঝায় তাকে বলে **ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা**। যেমন, তুমি বইটা পোড়ো। বর্তমান অনুজ্ঞায় 'পড়ো' শব্দে আদেশ বা অনুরোধ এবং 'পোড়ো' শব্দে অনুরোধ বা আদেশ প্রকাশ পাচ্ছে।

সাধারণত ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ায় 'ব', 'বে', 'বা' ব্যবহৃত হয়। এখানে 'পোড়ো' শব্দটি 'পড়িও' শব্দের চলিত রূপ। 'ব', 'বে' না থাকলেও অর্থের দিক দিয়ে 'পোড়ো' অর্থে 'পড়িবে' বলা হয়েছে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

বাক্য পরিবর্তনের কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হল :

(ক) বিস্ময়সূচক বাক্য : তাঁর অন্তঃকরণ কী অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হল!
নির্দেশক বাক্য : তাঁর অন্তঃকরণ অত্যন্ত অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হল।

(খ) হ্যাঁ-বাচক (সদর্থক) বাক্য : চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ অত্যন্ত বন্ধুর।
না-বাচক (নঞর্থক) বাক্য : চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ আদৌ মসৃণ নয়।

(গ) নঞর্থক : তিনি তাদৃশ ঐশ্বর্যশালী ছিলেন না।
সদর্থক : তিনি কম ঐশ্বর্যশালী ছিলেন।

(ঘ) আবেগসূচক বাক্য : কী অসাধারণ তাঁর গবেষণা!
নির্দেশক বাক্য : তাঁর গবেষণা ছিল অসাধারণ।

(ঙ) হ্যাঁ-বাচক বাক্য : বাইবেল ছুঁয়ে বলতে হবে।
না-বাচক বাক্য : বাইবেল না-ছুঁয়ে বলা চলবে না।

(চ) এক মিনিট চুপ করে শুয়ে থাক। (নির্দেশক বাক্যে)।
নির্দেশক বাক্য : এক মিনিট চুপ করে শুয়ে থাকতে বলছি।

(ছ) মানুষ মরতে চায় না। (প্রশ্নবাচক বাক্যে)
প্রশ্নবাচক বাক্য : মানুষ কি মরতে চায়?

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 15.2

1. ঠিক উত্তরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন। ভুল হলে (✗) চিহ্ন দিন :

(i) অর্থগত দিকে বাক্য হল ছ-রকমের। ( )

(ii) অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে থাকে ইচ্ছার ভাব। ( )

(iii) প্রশ্নবোধক বাক্যে জিজ্ঞাসা করা হয়। ( )

(iv) নির্দেশক বাক্যে স্বীকার অস্বীকার দুটোই করা যায়। ( )

(v) আবেগবাচক বাক্যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। ( )

2. অর্থগত বাক্য গঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

3. নীচের বাক্যগুলিতে অর্থের দিক দিয়ে কী ভাব প্রকাশ পেয়েছে? ডানদিক থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে মাঝের বন্ধনীতে তার সংখ্যাটি বসান :

(a) সন্দেহবাচক বাক্যে প্রকাশ পাচ্ছে	( )	(i)	একটি বিষয়ের ওপর আর-একটি বিষয়ের নির্ভরতার ভাব।
(b) আবেগসূচক বাক্যে রয়েছে	( )	(ii)	আকাঙ্ক্ষার ভাব।
(c) ইচ্ছাবাচক বাক্য প্রকাশ করছে	( )	(iii)	উপদেশের ভাব।
(d) শর্তসাপেক্ষ বাক্য হল	( )	(iv)	ঘৃণার ভাব।
(e) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য প্রকাশ করে	( )	(v)	সংশয়ের ভাব।

4. ইচ্ছাবাচক ও আবেগবাচক বাক্যের উদাহরণসহ পার্থক্য দেখান।

15.4 আপনি যা শিখলেন

1. গঠনগত দিকে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ;
2. বাক্যের শ্রেণিবিভাগে বাক্যের চেহারার পরিবর্তন;
3. বিভিন্ন শ্রেণির বাক্যের ব্যবহারে মনের ভাব বিভিন্নভাবে প্রকাশ করার রীতিপ্রকৃতি;
4. বিভিন্ন শ্রেণির বাক্যের ব্যবহারে বাংলা ভাষার বৈচিত্র্যের পরিচয়
5. বিভিন্ন বাক্যের রূপান্তর করার নিয়মকানুন;
6. অর্থগত দিকে বাক্যের বিভিন্ন শ্রেণির কথা;
7. অর্থের দিক থেকে একটি বাক্য অন্যটির তুলনায় চেহারায় আলাদা হলেও অর্থ একই বজায় রাখে;
8. অর্থগত দিকে বিভিন্ন বাক্যের পারস্পরিক পরিবর্তনের নিয়মরীতি;

শব্দার্থ ও টীকা

9. বিভিন্ন বাক্যের রূপান্তর করে মনের ভাবের বৈচিত্র্য প্রকাশ করার বিষয়;

10. অর্থগত দিকের বাক্যের সঙ্গে গঠনগত বাক্যের পার্থক্যের কথা।

15.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

বাক্যের গঠনগত রূপ বিষয়ক:

1. শ্রেণিগত দিকে বাক্য কত রকমের? প্রত্যেক প্রকার বাক্যের একটি করে উদাহরণ দিন।

2. গঠনগত দিক দিয়ে বাক্যকে ক'ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দিন।

3. যৌগিক ও জটিল বাক্য কীভাবে গঠিত হয়। একটি করে উদাহরণ দিয়ে দু-প্রকার বাক্যের পার্থক্য দেখান।

4. গঠন-অনুসারে তৈরি বাক্যগুলিকে নির্দেশমতো পরিবর্তন করুন :

(ক) সুভাষ-কাকিমা আমাকে ডেকেছেন কাজেই আমি যাব। (সরলবাক্যে)

(খ) জানি এ সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না। (যৌগিকবাক্যে)

(গ) দীনেশ রায়ের বৈঠকখানার উঁচু রোয়াকে বসে জনাকতক মিলে সেই আলোচনাই চালাচ্ছে। (যৌগিকবাক্যে)

(ঘ) তোমাদের পরিচিত সুরেনদা এখনই আসবেন। (জটিলবাক্যে)

(ঙ) উত্তর দেবার স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখেও এঁরা প্রশ্ন করতে ছাড়বেন না। (জটিলবাক্যে)

(চ) খবরটা বুড়োর কানে উঠলেই তো — মাছ খাওয়া, শাড়ি পরা ঘুচে যেত। (জটিলবাক্যে)

বাক্যের অর্থগত রূপ বিষয়ক:

1. অর্থগত দিক দিয়ে বাক্য কত রকমের? প্রত্যেক রকম বাক্যের একটি করে উদাহরণ দিন।

2. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য কোন্ কোন্ কালে ব্যবহার করা যায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

3. নীচের বাক্যগুলিতে যে যে ভাব প্রকাশ পাচ্ছে তার উল্লেখ করুন :

		আদেশ
(a)	আপনারা বসে পড়ুন।	_____
(b)	কোথা থেকে এলেন আপনি?	_____
(c)	আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।	_____
(d)	যদি তুমি একথা বল তাহলে আমাকেও কিছু বলতে হবে।	_____
(e)	বেঁচে থাকো বাবা।	_____
(f)	সে আসবে কিনা কে জানে।	_____

শব্দার্থ ও টীকা

4. নির্দেশক ও অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের পার্থক্য উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

5. অর্থগত দিকে বিভিন্ন বাক্যের নির্দেশমতো রূপান্তর করুন :

(ক) কোনো মানুষের পক্ষেই কি সম্ভব? (নির্দেশকবাক্যে)

(খ) এতদিনে সবাই জানতে পারল কথাটা। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

(গ) এমন সর্বনেশে কথা কখনও শুনিনি আমি। (হ্যাঁ-বাচক বাক্যে)

(ঘ) জগতের কেউ কখনও শুনেছে? (সন্দেহবাচক বাক্যে)

(ঙ) সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না। (হ্যাঁ-বাচক বাক্যে)

(চ) আমি উঠে পড়লাম। (না-বাচক বাক্যে)

(ছ) এসব কথা বলা অনুচিত। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

(জ) আমাকে আমার কাজ করতে দেওয়া হোক। (অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে)

(ঝ) লোকের বোঝাটাই তো শেষ কথা নয়। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

15.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

15.1

1. (ক) দুই

(খ) একটি সমাপিকা

(গ) অব্যয় পদ

(ঘ) একটি প্রধান ও এক বা একাধিক খণ্ডবাক্য

(ঙ) গঠনগত বাক্যের

2. চার রকমের। সরলবাক্য, যৌগিকবাক্য, জটিলবাক্য ও মিশ্রবাক্য।

3. জটিল, যৌগিক ও মিশ্র।

4. (ক) ✗ (খ) ✓ (গ) ✓ (ঘ) ✗ (ঙ) ✗

15.2

1. (i) ✗ (ii) ✗ (iii) ✓ (iv) ✓ (v) ✓

2. চেহারার পরিবর্তন হলেও অর্থের দিক দিয়ে একই থাকে।

3. (a) (v) (b) (iv) (c) (ii) (d) (i) (e) (iii)

শব্দার্থ ও টীকা

4. ইচ্ছাবাচক বাক্যে ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার ভাব থাকে আর আবেগবাচক বাক্যে প্রকাশ পায় বিস্ময়, ভয়, ভালোবাসা, ঘৃণা ইত্যাদি। উদাহরণ :

ইচ্ছাবাচক বাক্য : তুমি দীর্ঘজীবী হও।

আবেগবাচক বাক্য : হায়! এ কী হল!